আমরা কি মুসলমান ?
মুহাম্মদ কুতুব (রহ)
অনুবাদ - মুহাম্মদ মূসা

মুহাম্মদ কুতুব (রহ)

আমরা কি মুসলমান?

هَلْ نَحْنُ مُسْلِمُوْنَ؟

অনুবাদ

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বি. কম. (অনার্স); এম. কম; এম. এম.

আহসান পাবলিকেশন

ঢাকা

আমরা কি মুসলমান

هَلْ نَحْنُ مُسْلِمُوْنَ؟

মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব (রহ্)

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৬২২১৯৫

ISBN : 984-611-000-0

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৮
সপ্তম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১

প্রচ্ছদ : রফিকুল্লাহ্ গাযালী

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

বিনিময় : একশত বিশ টাকা মাত্র

AMRA KI MUSOLMAN (Are We the Muslim) Written by Muhammad Kutub in Arabic, Translated by Muhammad Musa into Bengali & Published by Ahsan Publication, Dhaka-1000, First Print July 1988, Seventh Print November, 2011 Price : 120.00 only. (U.S.$ 3.00 only)

AP-14

পেশ কালাম

আমরা কি মুসলমান? এ প্রশ্ন কেবল আল্লামা মুহাম্মদ কুতুবের একার নয়, আজ এটা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ-এর প্রশ্ন। আলোচ্য গ্রন্থটি ডঃ মুহাম্মদ কুতুবের هل نحن مسلمون গ্রন্থেরই বাংলা সংস্করণ। এই পুস্তকে বিজ্ঞ লেখক ইসলামের অর্থ ও তাৎপর্যকে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। সাহাবায়ে কিরাম এবং তৎকালীন যুগের মুসলিমগণ ইসলাম বলতে কি বুঝতেন তা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তিনি পাঠকদের সামনে পেশ করেছেন। মুসলিম সমাজ কিভাবে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হলো কখন থেকে এই বিচ্যুতির সূচনা, তা তিনি তথ্যপ্রমাণ সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন।

পাশ্চাত্যের খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ ও মিশনারী সংস্থাসমূহ রাজনীতি ও জনসেবার নামে মুসলিম দেশসমূহে অনুপ্রবেশ করে এবং আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের ছদ্মাবরণে তাদের ধর্ম, আকীদা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির উপর চরম আঘাত হানে।

প্রাচ্যবিদদের নামে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবিগণ ইসলামের বিকৃতি সাধনে গুরুতর ভূমিকা পালন করেন। তারা ইসলামের দরদী সেজে আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্ এবং ইসলামী ঐতিহ্যের অপব্যাখ্যা করে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করেন।

আল্লামা মুহাম্মদ কুতুবের বলিষ্ঠ কলম তাদের এসব গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্য মনোজ্ঞভাবে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছে। তিনি একদিকে মুসলিম উম্মাহ্-কে পাশ্চাত্যের অব্যাহত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন, অপরদিকে তাদেরকে ইসলামে নির্ভীক পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে আহবান জানিয়েছেন। পরিশেষে তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ভবিষ্যতে ইসলামই সমগ্র বিশ্বে বিজয়ীরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবে এবং এতে নিহিত রয়েছে বিশ্বমানবতার মুক্তি, কল্যাণ ও চিরশান্তি। বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মনে ইসলামী চেতনার উন্মেষে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।

তরুণ লেখক ও অনুবাদক মওলানা মুহাম্মদ মূসা ইতিপূর্বে সহীহ্ আল-বুখারী (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড), রিয়াদুস সালেহীন (১ম ও ৪র্থ খণ্ড), ইসলামী আকীদা, ইসলামে শিশু পরিচর্যা এবং আরও কতিপয় গ্রন্থের অনুবাদক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

আমি তার সুদীর্ঘ ও সফল জীবন কামনা করি।

রমযান ১৪০৮ হিজরী

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

দ্বিতীয় (আরবী) সংস্করণের ভূমিকা

আজকের দুনিয়া একদিকে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন একাধিক ব্লকে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে ওৎ পেতে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা সবাই একটি শত্রুতামূলক কাজে এবং একটি যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ। আর তা হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে এই বিপদ সম্পর্কে পূর্বেই আমাদের অবহিত করেছেন ঃ

وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا .

"তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই থাকবে, এমনকি তাদের ক্ষমতায় সম্ভব হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকেও সরিয়ে নিবে" (সূরা বাকারা ঃ ২১৭)।

অপরদিকে আজ এই দুনিয়া ভৌগোলিক, ভাষাগত এবং বংশগত সীমা ও বন্ধন ভুলে গিয়ে সামাজিক, নৈতিক অথবা চিন্তাগত ও আদর্শিক মতবাদের ভিত্তিতে সম্মিলিত হচ্ছে। এই মতবাদ ও মতাদর্শগুলো পরস্পর বিরোধী এবং পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং মুসলমানদেরকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ প্রথম থেকেই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস এবং এমন একটি বিশেষ প্রতীক ও নিদর্শন বাছাই করে রেখেছেন যা আমাদেরকে এই চতুর্মুখী যুদ্ধে সর্বাধিক প্রতীয়মান করে রেখেছে এবং আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে বিলীয়মান হতে বাধা দিচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ . مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ .

"আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন, আর এই কুরআনেও (তোমাদের এই নাম রাখা হয়েছে), যেন রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয় এবং তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকের উপর" (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)।

৬

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ .

"আর এভাবে আমি তোমাদের একটি মধ্যবর্তী উম্মাত বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)।

কিন্তু দুনিয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক অথবা আমাদের বিরুদ্ধে এই দুনিয়া জাতিসমূহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রতারণার ক্ষেত্রই হোক, প্রতিটি অবস্থায় আমাদের জয়যুক্ত হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে ঃ আমাদের মুসলমান হতে হবে। অতএব আমরা কি মুসলমান?

মুহাম্মদ কুতুব

সূচীপত্র

ভূমিকা

ইসলামের অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের মন-মগজে কেন এতটা বিকৃত রূপ ধারণ করে আছে? ইসলাম তো মানব জীবনের সার্বিক দিক পরিবেষ্টন করে আছে। বরং ইসলামের অর্থ মূলত এত ব্যাপক যে, শুধু মানুষ এবং তার জীবনই নয়, গোটা সৃষ্টিজগতের সমস্যাবলী ও ব্যাপারসমূহ তার আওতায় এসে যায়। কিন্তু আজ এই ব্যাপক অর্থ সংকুচিত হয়ে শুধু কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের প্রদর্শনীর নাম ইসলাম হয়ে আছে, যা কোন না কোন প্রকারে পালন করা হচ্ছে। বরং কোন কোন সময় তা কেবল নিয়াতের মাধ্যমে আদায় করা হয়। আবার কখনো তা একবারেই আদায় করা হয় না, নিয়াতের মাধ্যমেও নয় এবং অন্য কোন পন্থায়ও নয়। এরপরও আমরা মনে করি যে, আমরা মুসলমান এবং ইসলামের সত্যতা প্রমাণকারী।

ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান যা মানবজাতির গোটা জীবনকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করে। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বস্তুগত, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং চিন্তা ও মতাদর্শগত যাবতীয় সমস্যা ও বিষয় ইসলামের আওতায় এসে যায় এবং তা মানুষের গোটা কর্মময় জীবনকে বেষ্টন করে নেয়। কিন্তু আজ ইসলামের এই অর্থ বিকৃত হয়ে কতিপয় বিক্ষিপ্ত আকীদা-বিশ্বাসের নাম ইসলাম হয়ে আছে। বাস্তব জীবনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং মনে করা হচ্ছে যে, এই আকীদা-বিশ্বাসগুলো অন্তরের মধ্যে বিরাজমান থাকাই যথেষ্ট, চাই মুসলমানরা ইসলাম বিরোধী পরিবেশেই জীবন যাপন করুক না কেন। তারা এই পরিবেশকে অপছন্দও করছে না এবং তা পরিবর্তন করার চেষ্টাও করছে না। বরং যদি তলিয়ে দেখা হয় তবে তার গোটা জীবনেরই ইসলামের সাথে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার শিষ্টাচার ও রীতিনীতি অনৈসলামী, তার চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভংগী ইসলাম বিরোধী, বরং তার দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলীর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। মুসলমানদের ব্যক্তিগত ব্যাপারই হোক অথবা সমষ্টিগত সম্পর্ক বা রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক অথবা সরকারের সাথে কর্মচারীদের সম্পর্ক হোক, সবই অনৈসলামী।

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাংগ জীবনবিধানের নাম ছিল যা পূর্ণরূপে ইসলামী মূলনীতি ও চিন্তা-চেতনা এবং দীনের দৃষ্টান্তমূলক নমুনার উপর ভিত্তিশীল, যার মধ্যে দুনিয়া-আখিরাত, আসমান-যমীন, শাসক-শাসিত, নারী-পুরুষ এবং বংশ ও সমাজের যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পূর্ণাংগ দীন কিভাবে বিকৃত হয়ে মাত্র কতিপয় বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন ও গুরুত্বহীন আনুষংগিক বিষয়ের নাম হয়ে আছে, যার মধ্যে না আছে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক আর না তা থেকে কোন পথ নির্দেশ পাওয়া যায়। এটাকে কাপড়ের সামঞ্জস্যহীন ও বিচিত্র তালির সাথেই তুলনা করা যায়।

এই অলীক চিন্তা ও দৃষ্টিভংগী কোথা থেকে সৃষ্টি হলো যার ফলে ইসলাম দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে? একদিকে কতিপয় বিশ্বাস, অপরদিকে মানুষের কর্মময় জীবন। এই দু'টি বিষয়ের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এর ফলে মনে করা হতে লাগলো যে, ইসলাম কর্ম-বিবর্জিত কতিপয় ধারণা-বিশ্বাসের নাম। মুসলমানদের অন্তরে কিভাবে এ ধারণা জন্মালো যে, তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক নীতিমালা, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় রীতিনীতি দুনিয়ার কোনো ইসলাম বিরোধী সমাজ থেকে ধার করে নিয়ে তদনুযায়ী কাজ করার পরও মুসলমান থাকতে পারে?

মুসলমানদের জন্য এরূপ ধারণা করা কিভাবে সম্ভব হলো এবং তারা প্রতিটি ব্যাপারে নিজেদের প্রতিপালকের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং তাঁর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য উপেক্ষা করে জিনিসপত্রে ভেজাল মেশাতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে, বিশ্বাস ভংগ করতে পারে, মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে, হালাল-হারামের সীমালংঘন করে হারাম এবং নিষিদ্ধ উপায়-উপকরণের দ্বারা ফায়দা উঠাতে পারে এবং এই ফায়দা উঠানোর লালসায় যে কোন ধরনের অপমান ও লাঞ্ছনাও সহ্য করতে পারে? অতঃপর তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব থেকে বেপরোয়া হয়েও মুসলমান থাকতে পারে? এই মুখাপেক্ষীহীনতা নিজেদের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইসলামকে অনুসরণ না করার মাধ্যমেই হোক অথবা ইসলামের প্রচারকার্য পরিত্যাগ করে জুলুম, অবাধ্যতা ও গুনাহর উপর ভিত্তিশীল এক অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে শরীক হওয়ার মাধ্যমেই হোক, এই সব কিছু করার পরও তারা আন্তরিকতা সহকারে অথবা অনুপস্থিত মনে মাত্র কয়েক

রাক্‌আত নামায আদায় করার পর এই ধারণা করতে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যেসব দায়-দায়িত্ব আরোপ করেছেন তা থেকে তারা মুক্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন।

একইভাবে মুসলিম মহিলারা কি করে এরূপ ধারণা করতে লাগলো যে, তারা নিজেদের প্রতিপালকের নির্দেশসমূহ লংঘন করে এবং তাঁর পক্ষ থেকে সোপর্দ করা আমানতের খেয়ানত করে ধোঁকাবাজি করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে, গীবত করতে পারে, উলংগ অবস্থায় রাস্তায় নেমে প্রতিটি কামুক চোখ এবং পাশবিক প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করতে পারে? আর তারা ধারণা করতে থাকে যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার কোন দায়িত্ব তাদের নেই, চাই এ দায়িত্ব তার নিজের ব্যক্তিগত কর্মধারাকে পরিবর্তন করার সাথে সম্পৃক্ত হোক, চাই নিজের সন্তানদের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার দাওয়াতের সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক। সে তার এই দৃষ্টিভংগীর কারণে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় অংশীদার হয়ে যায় যা জুলুম-নির্যাতন ও গুনাহ্‌র উপর ভিত্তিশীল। এরপরও সে ধারণা করতে থাকে যে, তার অন্তরের কোন গভীর কোণে নিহিত তার সৎ উদ্দেশ্যের কারণে আল্লাহ্‌র কাছে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত সাব্যস্ত হবে এবং তাকে মুসলমানদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হবে।

এই অদ্ভুত চিন্তাধারা কোথা থেকে আসলো যা বলছে—সামাজিক সংগঠন ও অর্থনীতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্তির এবং সমাজের মধ্যকার অথবা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মের কি যোগসূত্র আছে? বরং মানুষের বাস্তব জীবনের কর্মধারার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে দীন এবং প্রচলিত রসম-রেওয়াজের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে ধর্মের কোন যোগসূত্র নেই। অনুরূপভাবে শিল্পকলা, সাংবাদিকতা এবং রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিশনের সাথেও ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। সংক্ষেপে বলা যায়, মনে হচ্ছে দুনিয়ার এই বাস্তব জীবনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই এবং ধর্ম ও জীবনযাত্রা দু'টি ভিন্নতর জিনিস।

দীন ইসলামকে মুসলমানদের মাঝে এই যে চতুর্মুখী অনিষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে, এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কেননা ইসলামী সমাজ যতদিন প্রকৃত

ইসলামের উপর চলছিল ততদিন এরূপ করুণ অবস্থা ছিলো না। বরং সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, মুসলিম সমাজ নিকট অতীতে অর্থাৎ ফরাসীদের (মিসর) আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ ছিলো না, যদিও অতীতের দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এর মধ্যে অনেক অনিষ্টকর জিনিস ঢুকে পড়েছিল।

ইসলামের ইতিহাসে দীনের অতুলনীয় আহকাম এবং কর্মময় জীবনের মধ্যে পার্থক্যের সূচনা যদিও অনেক পূর্বে অর্থাৎ উমাইয়্যা রাজবংশের শাসনামলেই সৃষ্টি হয়েছিল—কিন্তু পার্থক্যটা এমন পর্যায়ের ছিল যার ফলে সামগ্রিকভাবে ইসলামী সমাজের মূলনীতি ও আইন-কানুনের মধ্যে বিশংখলা সৃষ্টি হয়নি।

সরকারী প্রশাসন কর্তৃপক্ষ রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত থেকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারসমূহকে আংশিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করতে পেরেছিল; কিন্তু রাজধানীর বাইরের সমাজ অনেকাংশে ইসলামের মূলনীতি ও আইন-কানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামাজিক জীবনের ছোট-বড়ো সব বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব বলবৎ ছিল। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, গোটা সমাজ ব্যবস্থা মৌলিকভাবে ইসলামের উপর ভিত্তিশীল ছিল, যাবতীয় আইন-কানুনের উৎস ছিল একমাত্র ইসলামী শরীয়াত। অতঃপর যখন তুর্কী উসমানী রাজবংশের শাসনামল শুরু হলো তখন দীন এবং দুনিয়ার মাঝখানে সম্পর্কহীনতার দৃষ্টিভংগী আর সমাজের মন-মানসিকতা একান্তভাবেই ইসলামী ছিল। বাস্তব কর্মক্ষেত্রেও নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার, আদান-প্রদান, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা সব কিছুই ইসলামের প্রভাবধীন ছিল।

শেষ পর্যন্ত যখন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে সর্বশেষ ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো যা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল—তখন থেকে মুসলিম সমাজের মধ্যে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং ধর্ম ও কর্মময় জীবনের মাঝখানে ব্যবধান সীমা অতিক্রম করে গেলো।

কোন্ সব কারণে ইসলামের চূড়ান্ত, পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক অর্থ সংকুচিত হয়ে এতোটা বিকৃত হয়ে গেলো যে, এখন মাত্র কতিপয় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অংশের নাম ইসলাম হয়ে গেছে? এর মধ্যে না আছে কোন আন্ত-সম্পর্ক, আর না তার মাধ্যমে কোন পথনির্দেশ পাওয়া যায়। অথবা আজ তা মাত্র কতিপয় আন্তরিকতাপূর্ণ অথবা প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠানসর্বস্ব সমষ্টি হয়ে আছে—যার

আদায়কারী মনে করে যে, এটাই পরিপূর্ণ ইসলাম। তারা মনে করে নিজেদের প্রতিপালকের কাছে এই ইবাদত নিয়েই উপস্থিত হবে। আর এর ভিত্তিতে তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে ; অথচ আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে মজীদে বলেছেন যে, এটা সেই ইসলাম নয়—যা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। যেসব কারণে ইসলামের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যই এই পুস্তক রচিত হয়েছে।

আমরা যখন জানতে পারবো, এই বিকৃতি কিভাবে সৃষ্টি হলো এবং কিভাবে বিস্তার লাভ করলো—তখন এই প্রতারণাপূর্ণ চক্রান্তকে উপলব্ধি করে পুনরায় ইসলামের কাছে ফিরে আসতে পারবো। বান্দা যা করার ইচ্ছা করে—আল্লাহ্ তার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।

মুহাম্মদ কুতুব

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ .

"তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে কি পশ্চিমদিবে তা প্রকৃত কোন পুণ্যের ব্যাপার নয়, বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ এবং নবীদেরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিকের জন্য, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এতদ্ব্যতীত নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে, দারিদ্র, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে ধৈর্য ধারণ করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী, এরাই মুত্তাকী" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)।

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ الْاِيْمَانُ بِالتَّمَنِّى وَلَا بِالتَّحَلِّى وَلٰكِنْ هُوَ مَا وَقَّرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ .

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং মুমিনের মতো অবয়ব বানিয়ে নিলেই ঈমান সৃষ্টি হয় না। বরং ঈমান সেই সুদৃঢ় আকীদা যা হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।"

১
ইসলামের প্রকৃত অর্থ

প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ ইসলাম বলতে কি বুঝতেন? আর আমাদের জন্য ইসলামকে বুঝা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

নিঃসন্দেহে প্রথম যুগের মুসলমানরা কখনো ইসলামের এমন অর্থ করেননি, যে অর্থ আজ আমরা করছি। অর্থাৎ আমরা ইসলাম বলতে যা বুঝেছি তা হচ্ছে ঃ ইসলাম কয়েকটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ইবাদতের সমষ্টির নাম যা মানুষ পালন করে থাকে। জীবনের অন্য কোন বিষয়ের সাথে ইসলামের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। আমরা আরো মনে করি, মানুষের কর্মজীবন দু'ভাগে বিভক্ত। এক ধরনের কাজ বিশেষ বিশেষ সময় করতে হয় অর্থাৎ ইবাদতের সময় সে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। অতঃপর জীবনে অন্যান্য ব্যাপারে গাইরুল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করবে।

অপরদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবা ও তাদের পরবর্তী যুগের মনীষিগণ (তাবিঈন) ইসলামের যে অর্থ করতেন তা এই যে, মানুষ তার গোটা সত্তাকে আল্লাহ্‌র কাছে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে, তার সমগ্র অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট হয়ে থাকবে। অর্থাৎ তার চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মজীবনের সমস্ত বিভাগ কানুনে ইলাহীর অনুগত হয়ে যাবে। আমাদের পূর্ববর্তী কালের মনীষিগণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' নামক কলেমাটি শুধু মুখে মুখে আওড়ানো একটি বাক্য মনে করতেন না, যার অর্থ এবং তাৎপর্যগত প্রভাব ও ফলাফল অন্তরের গভীরে এবং কর্মময় জীবনের ওপর প্রতিফলিত হয় না। বরং তাঁদের মতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর' অর্থ এ-ই ছিলো যে, একমাত্র আল্লাহ্-ই এ বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি। বিশ্বের মাঝে ঘটমান প্রতিটি জিনিসের প্রকৃত পরিকল্পনাকারী কেবল তিনিই। অতএব শুধু তার দাসত্ব করতে হবে এবং সবার অন্তর তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির অনুভূতি সহকারে তাঁর দিকে আকৃষ্ট থাকবে। তিনিই জীবনের এই সুযোগ দানকারী এবং তিনিই মৃত্যুর ফয়সালাকারী। তিনিই রিযিক দানকারী এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

অতঃপর তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বাক্যের এই অর্থ বুঝতেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার দাসত্ব করা, গাইরুল্লাহ্কে ভয় করা অথবা এই ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি অথবা আসমান বা জমীনের কোন শক্তি মানুষের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করতে পারে—এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ শির্ক। তারা এ ধরনের শির্ক থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। উপরন্তু তাঁরা কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর অর্থ আরো মনে করতেন যে, মহান আল্লাহ্-ই একমাত্র প্রভু ও বিচারক। তিনিই মানবজাতির জন্য শরীআত জারি করেন এবং তাদের জীবন যাপনের জন্য আইন-বিধান প্রণয়ন করেন। তিনি ছাড়া আসমান ও জমীনে এমন কোন শক্তি নেই, যে এ কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। এই মৌলনীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ কোন নতুন জিনিস নয়, বরং সৃষ্টির সূচনা থেকে এবং মানবজাতির অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বরং হযরত আদম আলাইহিস সাল্লামকে যখন পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয় তখন নিম্নোক্ত কথা বলা হয়ঃ

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

"আমি বললাম, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর আমার নিকট থেকে যে জীবনবিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য ভয় এবং চিন্তার কোন কারণ নেই। আর যেসব লোক তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণীকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চিত জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৩৮-৩৯)।

অনুরূপভাবে প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যের উপর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ এই মনে করতেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন সেই রাসূল যাঁকে এ মহান রিসালাত ও উল্লেখিত হেদায়াতের প্রচার ও প্রসারের জন্য নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়েছে। তাঁর আনুগত্য

করা এবং এই হেদায়াত অনুযায়ী আমল করা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। তিনিই আল্লাহ্‌র পয়গাম তাদের কাছে পৌছে দেন। তাঁর আনুগত্য করাও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মতই অত্যাবশ্যকীয়।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ·

"আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে এজন্য পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে" (সূরা নিসা ঃ ৬৪)।

وَمَا أٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ·

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যে জিনিস থেকে তোমাদের বিরত রাখে (নিবেধ করে) তা থেকে বিরত থাকো" (সূরা হা্শর ঃ ৭)।

তাঁরা এও মনে করতেন যে, একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাই আল্লাহ্‌র পয়গামের জীবন্ত ব্যাখ্যা এবং তিনিই মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ ও প্রতিটি কাজে পথপ্রদর্শক। তিনি মুসলমানদের জামায়াতের নেতা এবং তাদের শিক্ষক ও প্রশিক্ষণদাতা। তিনি সেই নূরের সমুজ্জ্বল আলোকবর্তীকা, মানবজাতি যেখান থেকে আলো অর্জন করে নিজেদের জীবনের অন্ধকার গলি থেকে বের হয়ে হেদায়াতের রাজপথে উঠে আসতে পারে।

মূলত কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর সাক্ষ্য দেয়ার একটি সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে এটাই। এ অর্থ যখন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে পূর্ণরূপে বসে যায় তখন তাকে খাঁটি মুসলমান বলা যেতে পারে। আর এ অর্থই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক সত্য যা কোন মানুষের অন্তরে বসে গেলে তার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সে সিরাতে মুস্তাকীম অর্থাৎ যে পথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে গেছে তার ওপর চলতে থাকে।

কলেমা তাইয়েবার এই সংক্ষিপ্ত অর্থ থেকে অথবা বলা যায় এর সাথে কুরআন মজীদের বিস্তারিত বিবরণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব কর্মময় জীবনের আলোকে আরো ব্যাপক ধারণার প্রসার ঘটে, যা আমাদের পূর্বসূরীদের হৃদয়ে গভীরভাবে বদ্ধমূল ছিল। তাদের চিন্তা-চেতনা এবং

তাদের কর্মময় জীবনে তার দ্যুতি স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হতো। যদিও তারা এই ব্যাপক ধারণার ওপর আমাদের মতো কোন দর্শন নির্মাণ করেননি এবং এই বিষয়বস্তুর ওপর আমাদের মতো বৃহদাকারের বই-পুস্তক রচনা করেননি।

এই লোকেরা পূর্ণরূপে মনে করতেন যে, শুধু অন্তরের গোপন উদ্দেশ্য বা নিয়াতই ইসলাম হতে পারে না এবং যতক্ষণ এ নিয়াতের স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ বাস্তব জীবনে এবং মানুষের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে না থাকে, ততক্ষণ বাস্তবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে এ ধরনের নিয়াতের কোন গুরুত্ব নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَيْسَ الاِيْمَانُ بِالتَّمَنِّى وَلاَ بِالتَّمَلِّى وَلٰكِنْ هُوَ مَا وَقَّرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ ۔

"মুমিন হওয়ার আকাঙক্ষা পোষণ করতে থাকলেই এবং মুমিনের মতো দেহাবয়ব ধারণ করলেই মুমিন হওয়া যায় না, বরং ঈমান সেই সুদৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস যা মানুষের হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং মানুষের কার্যকলাপ তার সত্যতা প্রমাণ করে"।

বর্তমান কালে আমরা যখন দর্শন, বিশেষ করে মনস্তত্ত্ব বিদ্যার উপর ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে বর্ণিত নিগূঢ় তত্ত্বের সত্যতা এবং মানব জীবনের উপর এর গভীর প্রভাব সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়। মানুষ কখনো এরূপ অনুভব করে যে, কোন বিশেষ মতবাদ সম্পর্কে সে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়ে গেছে এবং এ সম্পর্কে এতো কিছু জেনে ফেলেছে যে, আরো অধিক জানার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে না। এরূপ অবস্থায় সে এ সম্পর্কে আরো চিন্তা-ভাবনা করা এবং অন্যদের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করে না। কেননা সে ধারণা করে যে, এ ব্যাপারটি তো তার অন্তর ও মন-মগজের গভীরে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল এবং চূড়ান্ত হয়ে আছে। এ সম্পর্কে তার মনে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ বা জটিলতা নেই। কিন্তু কিছুকাল পর তার সামনের পর্দা সরে যায়। তখন সে দেখে, তার এ ধারণা শুধু প্রতারণা মাত্র, বাস্তবের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আর যদিও এর মধ্যে কিছু সত্য থেকেও থাকে তাহলে তা তার জীবনের গাড়ী পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট নয়।

কখনো সে বসে বসে স্বপ্ন দেখতে থাকে যে, সে এক ধাক্কায় গোটা পৃথিবী প্রকম্পিত করে দিতে পারে। কিন্তু যখন সে বাস্তবে একটি টেবিল সরাতে চায় তখন অনুভব করে যে, এটা সরানো কষ্টকর ব্যাপার এবং এজন্য তার আরো শক্তির প্রয়োজন অথবা এ কাজ করার জন্য তার আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা ও আকাঙক্ষা আরো তীব্রতর হওয়া দরকার। তাহলে সে টেবিলের দিককার প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সমপরিমাণ শক্তির মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। অতঃপর তার শক্তি যতই বৃদ্ধি পাবে ততই সে বহির্দুনিয়ায় অগ্রসর হয়ে যেতে পারবে। মন-মানসিকতা ও আবেগের মধ্যে নিহিত শক্তিকে পরিমাপ করার জন্য এ গতিই হচ্ছে সঠিক পরিমাপ যন্ত্র। এই সত্য কেবল মানুষের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, বরং এটা এ মহাবিশ্বের বাস্তব সত্য এবং প্রাকৃতিক বিধানের একটি স্বীকৃত মূলনীতি।

যন্ত্রশক্তির আবিষ্কারকদের এই মূলনীতি ভালো করে জানা আছে। কোন জিনিসের ভিতরে লুক্কায়িত শক্তিই গতির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং প্রথমে আভ্যন্তরীণ শক্তির বহিশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া জরুরী। অর্থাৎ সংকল্প বাস্তব কর্মের রূপ লাভ করবে, অতঃপর তাতে এতোটা বৃদ্ধি ঘটতে হবে যে, তা শুধু মোকাবিলা ও প্রতিরোধই করবে না, বরং তা থেকেও অগ্রগামী হবে। তাহলে বাস্তব জীবনের জন্য যে গতির প্রয়োজন তা সৃষ্টি হতে পারবে। গতি, যা মূলত এ বিশ্বের জীবনী শক্তি, তা এই মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রথমে অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ্য বা বহিশক্তিতে পরিণত হবে, অতঃপর তাতে একটা পরিবৃদ্ধি ঘটবে যা প্রতিরোধে সক্ষম হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

মানবসত্তাও, যা স্বয়ং এ বিশ্বের একটি অন্যতম শক্তি, এ বিধানের অধীনে কর্মতৎপর। কেননা বিশ্বের মহাশক্তির অভ্যন্তরে জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পদার্থ ও শক্তি হচ্ছে একই জিনিসের দু'টি নাম।

উল্লিখিত মূলনীতি অনুযায়ী এ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, শুধু নিয়াত (অভিপ্রায়) ও সংকল্পই যথেষ্ট নয়। কেননা নিয়াত এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি যা গতিতে পরিণত হয়নি, কাজেও পরিবর্তিত হয়নি এবং যা এখনো কোন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। এখন চিন্তার বিষয় এই যে, মানব জীবনে এমন কি স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যার প্রতিরোধ কেবল

নিয়াতের মাধ্যমে সম্ভব নয় এবং যার মোকাবিলা করার জন্য প্রথমে নিয়াতকে বাস্তব শক্তিকে পরিবর্তন করা, অতঃপর তার পরিবৃদ্ধি ঘটানো প্রয়োজন? তাহলেই জীবনে আসল গতি সৃষ্টি হবে। এই প্রতিবন্ধকতার সংখ্যা অনেক। এর কতগুলো মানুষের নফ্সের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং কতগুলো কর্মজীবন ও এর বাইরে বিদ্যমান রয়েছে।

নফ্সের দিক থেকে যেসব প্রতিবন্ধকতা আসে তা হচ্ছে ঃ সম্বন্ধ-সম্পর্ক, অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ, বিলাসবহুল জীবনের আকাঙক্ষা, শ্রমবিমুখতা, ভয়ভীতি ও দুঃখ-মুসীবতের আশংকা ইত্যাদি। এ সবকে একত্রে 'প্রবৃত্তি' নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। অর্থাৎ নফ্সের পসন্দনীয় চাহিদা পূর্ণ করার ঝোঁকপ্রবণতা।

কর্মময় জীবনে যেসব প্রতিবন্ধকতায় সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে জুলুমের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা। দ্বিতীয় হচ্ছে বিদ্রোহী শক্তির অস্তিত্ব, যা অধিকাংশ সমাজে পাওয়া যায় এবং যা গোটা সমাজে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এই শক্তির যদি সমষ্টিগত নামকরণ করা হয়, তাহলে তাকে 'তাগূত' বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এমন প্রতিটি শক্তি যা নিজের সীমা অতিক্রম করে যায় এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

নফ্সের প্রবৃত্তি এবং বহির্দুনিয়ার তাগূত এমন দু'টি প্রতিবন্ধক যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নিয়াতকে এমন বাস্তব শক্তিতে পরিণত করা দরকার যা তার মোকাবিলা করতে পারে। অতঃপর এই শক্তি আরো পরিবর্ধিত হতে হবে যাতে এমন একটি স্থায়ী বিপ্লব সাধিত হতে পারে, যা প্রাকৃতিক বিধান এবং আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে সংগতিপূর্ণ হবে। নফ্সের আভ্যন্তরীণ দুনিয়ার প্রবৃত্তি এবং বাইরের দুনিয়ার তাগূত দু'টি কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শক্তি। এ কারণে শুধু নিয়াতই এই শক্তির প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট নয়, এর ওপর বিজয়ী হওয়া এবং সঠিক পথে চলার জন্য গতির সৃষ্টি করা তো দূরের কথা।

এটা মানুষের প্রবৃত্তি এবং জীবনের এক বিরাট বাস্তবতা, যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুভূতি ছিলো। এজন্য তিনি বলেছেন ঃ "মুমিন হওয়ার জন্য আকাঙক্ষা করতে থাকলেই এবং মুমিনের মতো বেশভূষা ধারণ করলেই মুমিন হওয়া যায় না। বরং ঈমান সেই সুদৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস যা মানুষের হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয় এবং মানুষের কার্যকলাপ তার সত্যতা প্রমাণ করে।"

অনুরূপভাবে সাহাবায় কিরামের মধ্যেও এ অনুভূতি তীব্রতর ছিল। এজন্য তাঁরা নিজেদেরকে এবং সমাজকেও ইসলামের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বাস্তব জীবনে একনিষ্ঠ ও পবিত্র নিয়াতের স্থান ও মর্যাদা কতটুকু ? অথবা বলা যায়, এর মধ্যে খারাপের দিক কি আছে ? এর মধ্যে খারাপ দিক হচ্ছে, এটা একটা প্রতারণা। নেক নিয়াতের কল্পনাবিলাসে লিপ্ত হয়ে কোন ব্যক্তি ধারণা করতে থাকে যে, সে এক ধাক্কায় গোটা দুনিয়া আন্দোলিত করতে পারে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে একটি টেবিল সরাতে যে শক্তির প্রয়োজন সে সম্পর্কেও তার অভিজ্ঞতা নেই।

কোন ব্যক্তি পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে বিশ্বাস করে যে, তার কলব পরিষ্কার আছে, উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, স্বভাব-প্রকৃতি সহজ-সরল এবং আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমরা তার এ কথাগুলো স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু যখন তার কাছে দাবি করা হয় যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে তুমি নিজের নফ্‌সের যে কোন প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করো, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাস পরিবর্তন করো অথবা এই সমাজের রসম-রেওয়াজ পরিবর্তন করে দাও যেখানে তুমি বসবাস করছো অথবা তার কাছে যদি দাবি করা হয় যে, সমাজের মানুষগুলোকে ভ্রান্ত পথে চলতে বাধা দাও অথবা তাদেরকে নিজের রাস্তা থেকে হটিয়ে দাও, যাতে অন্তত তারা তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং তা করতে তোমাকে যে নির্যাতন ও জুলুমের সম্মুখীন হতে হবে তাতে ধৈর্য ধারণ করো অথবা তার কাছে যদি দাবি করা হয় যে, সামনে অগ্রসর হয়ে (যে কোন ধরনের) তাগূতের মোকাবিলা করো, তাতে তোমার জীবন বিপদের সম্মুখীনই হোক না কেন, এসময় তার ভূমিকা কি হবে ? মূলত এ সময়ই জানা যাবে যে, তার মনের মধ্যে লুকায়িত একনিষ্ঠ ও পবিত্র নিয়াতের আসল পরিমাণ ও ওজন কতটুকু ?

এ কথা সত্য যে, অন্তরের একনিষ্ঠ ও পবিত্র নিয়াত ছাড়া কোন কাজের কোন মূল্য নেই। কিন্তু নিয়াতও যতক্ষণ একটি প্রভাবশালী শক্তির রূপ নিয়ে বাস্তব জীবনে কার্যকর ভূমিকা পালন না করবে ততক্ষণ নিয়াতেরও কোন গুরুত্ব ও মর্যাদা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এজন্য তিনি বাস্তব কর্মের মাধ্যমে ঈমানের প্রমাণ পেশ করার

দাবি করেছেন। অন্তরের গোপনে রক্ষিত নেক নিয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে ঃ এর মাধ্যমে নফ্সের কুপ্রবৃত্তি এবং তাগূতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি সৃষ্টি হবে। এই নেক নিয়াত যদি প্রবৃত্তি ও তাগূতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তিতে পরিণত না হয়, তাহলে এর মর্যাদা একটি সুদৃশ্য বুদ্বুদের অধিক নয় যা স্পর্শ করার সাথে সাথে শূন্যলোকে বিলীন হয়ে যায়।

এজন্যই ইসলাম শুধু নিয়াতকেই যথেষ্ট মনে করেনি যে, কেউ নিজের মনের মধ্যে নেক নিয়াত (সৎ সংকল্প) নিয়ে বসে থাকবে এবং বাস্তব জীবনে কোন অর্থপূর্ণ কাজ সমাধা করবে না এবং সাথে সাথে মুসলমানও থেকে যাবে। এ কারণেই কুরআন মজীদে যেখানেই 'আল্লাযীনা আমানূ' (যেসব লোক ঈমান এনেছে) বলা হয়েছে, তার সাথে অবশ্যই 'ওয়া আমিলুস সালিহাত' (এবং নেক কাজ করেছে)-এর শর্তও আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান হচ্ছে এমন জিনিস যা অন্তরের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং বাস্তব কর্মের মাধ্যমে তার সত্যতার প্রমাণ দিচ্ছে।

এ কারণেই ইসলাম হচ্ছে ফিতরাতের ধর্ম বা স্বভাব সুলভ ধর্ম। কেননা এ ধর্ম সব সময় বিশ্বপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এটাই (আমল ব্যতীত শুধু নেক নিয়াত যথেষ্ট নয়) হচ্ছে বাস্তব সত্য, যা প্রথম যুগের মুসলমানগণ ইসলামের অর্থের মধ্যে পেয়েছেন। আর এ সত্যের সাথে পূর্ণরূপে পরিচিত থাকার কারণেই তাঁরা ইসলামী চিন্তাকে কর্মের জগতে বাস্তব রূপ দান করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সুখ-স্বপ্ন ও কল্পনাবিলাসকে কখনো যথেষ্ট মনে করেননি। তারা জীবনের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামীকরণ করার জন্য, বাস্তব জগতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার এবং কার্যত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যও যাবতীয় উপায়ে চেষ্টা-সাধনা করেছেন।

প্রথম যুগের মুসলমানদের কারো মন-মানসিকতায় কখনো এরূপ খেয়াল ছিলো না যে, কোন ব্যক্তি তার কর্মময় জীবনে ইসলাম বিরোধী কর্মপন্থা অবলম্বন করতে থাকার পরও শুধু নেক নিয়াতের জোরে মুসলমান থাকতে পারে। কেননা আল্লাহ অন্তরের মালিক, মানুষের মনের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত এবং বান্দার যাবতীয় কাজের পিছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। বরং তারা এ সত্য ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, নিয়াত ও কাজ একই জিনিসের দু'টি দিক। যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়টি একত্রে

বিদ্যমান না থাকবে, শুধু একটির সাহায্যে কোন ফল লাভ করা যাবে না। আমল ছাড়া কেবল নেক নিয়াত একটি ফাঁপা আকাঙক্ষা মাত্র। এর সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে নেক নিয়াত বা সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন কাজ করা হলে তাও মূল্যহীন ও নিষ্ফল হয়ে যায়। যে কাজের পেছনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়াত কার্যকর থাকে কেবল সেই কাজই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। নেক নিয়াতের অর্থ মূলত এটাই। অনুরূপভাবে দুনিয়ার মানদণ্ডও নিয়াতের মধ্যকার ত্রুটিকে প্রকাশ করে দেয়, যদিও এতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়।

প্রথম যুগের কোন মুসলমানই এরূপ ধারণা করেননি যে, জীবনের কোন একটি ব্যাপারেও, যেমন সহজ উপায়ে গনীমতের মাল অর্জনকে, অগ্রাধিকার দেয়া অথবা আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার পরও শুধু নেক নিয়াতের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি মুসলমান থাকতে পারে। অথচ সে কোন অনৈসলামী সমাজ, তার রীতিনীতি ও সীমা লঙ্ঘনকে সমর্থন করে যাচ্ছে শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, সে সুখ-শান্তি লাভ করতে পারবে অথবা এই সমাজে সে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ পেয়ে যাবে অথবা নিজেদেরকে অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। এই নির্যাতন মানুষের উপহাস ও তিরস্কারের আকারেই হোক অথবা বস্তুগত নির্যাতন হোক, যেমন খাদ্য-পানীয় থেকে বঞ্চিত করা অথবা জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া ইত্যাদি।

তাঁরা ইসলামের অর্থ এ-ই বুঝেছেন যে, ইসলাম বলতে তার নির্দেশসমূহকে কর্মময় জীবনে কার্যকর করা। অর্থাৎ মুসলমানদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিও ইসলাম অনুযায়ী হতে হবে, এজন্য তাকে যতো বড়ো বিপদের সম্মুখীন হতে হোক না কেন। অনুরূপভাবে তাদের সমাজও ইসলামের নীতির ভিত্তিতে গঠিত হবে, এজন্য যতো বড়ো ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হোক না কেন।

এখানে একটি সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষের মন সব সময় একই অবস্থার উপর স্থির থাকতে পারে না। সব সময় সে বিপদ-মুসীবতের মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا "মানুষকে অনেক দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে" (সূরা নেসা ঃ ২৮)।

যেহেতু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত, তাই বান্দা যদি বারবার একই অপরাধ না করে তাহলে তিনি তার পদস্খলনকে মাফ করে দিয়ে তার তওবা কবুল করে নেন।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۔ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۔

"আল্লাহ নেক্‌কার লোকদের পসন্দ করেন। আর যাদের অবস্থা এমন যে, তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে বসে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে বসে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর আল্লাহ ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন কে আছে? এই লোকেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদের অন্যায় কাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৩৪-১৩৫)।

কিন্তু কুরআনে বর্ণিত এ বাস্তব সত্য (মানুষ দুর্বল সৃষ্টি) এবং শুধু নেক নিয়াতকে জীবন ও ইসলামের জন্য যথেষ্ট মনে করে নেয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর এমন বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করেন যারা নেক নিয়াতকে বাস্তব কর্মের রূপ দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। যদি এ চেষ্টায় তাদের পদস্খলন হয়ে যায় তাহলে তারা এ পদস্খলনের ওপর অনড় থাকে না, বরং উঠে দাঁড়িয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর অনুগ্রহ করেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ক্ষমা করেন।

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّـٰاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

"কিন্তু যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে এদের দোষত্রুটিকে আল্লাহ ভালো কাজের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিবেন। তিনি বড়োই ক্ষমাশীল দয়াবান" (সূরা ফুরকান ঃ ৭০)।

প্রথম যুগের মুসলমানগণ ইসলামের অর্থ এও মনে করতেন না যে, তারা নেক নিয়াতের অধিকারী হয়ে অনৈসলামিক সমাজকে তার নিজস্ব অবস্থায় থাকতে দিলে তাদের মুসলমানিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যতক্ষণ তারা এর ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে এবং এর খারাপ কাজে অংশগ্রহণ না করে। বরং তাদের মতে মুসলমান হওয়ার অর্থ এই ছিলো যে, তাদেরকে এ অবাধ্য সমাজ ব্যবস্থাকে এমন অনুগত সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার চেষ্টা করতে হবে, যা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখে এবং তাঁর নাযিলকৃত আইন-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। যদি তারা এ চেষ্টা না করেন তাহলে তারা মুসলমান হতে পারেন না। ইসলামের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারার কারণেই তাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতা ইসলামের আয়ত্তাধীন ছিল।

ইসলাম হচ্ছে একটি আন্দোলনের নাম যা মানুষের অন্তরে ও বাস্তব জগতে যুগপৎভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটা কখনো সম্ভব হতে পারে না যে, ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস তো মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে তার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না। এ আলোড়নই প্রথম যুগের ইসলামী সমাজে সৃষ্টি হয়েছিলো। যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সামনে রেখে প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী তৈরী করেছিলেন, তাদের অন্তরে তা বদ্ধমূল হয়ে যাবার ফলে ইসলামী আন্দোলন তৎকালীন জাহিলী ও বিদ্রোহী সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এ সমাজকে তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তন করান এবং পথভ্রষ্ট লোকদের হেদায়াতের পথে নিয়ে আসেন। তারা সে যুগে পদদলিত মূল্যবোধকে উন্নত করে মানুষের উপযোগী মানে নিয়ে আসেন। নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার প্রতিটি স্তরে ও প্রতিটি পর্যায়ে তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হেদায়াতের উপর অবিচল ছিলেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মময় জীবনের নমুনা নিজেদের দৃষ্টির সামনে রাখেন। তারা নিজেদের এই লক্ষ্য অর্জনে এজন্যই সফলকাম হতে পেরেছিলেন যে, তারা এ অসাধ্য সাধনের সংকল্প করে নিয়েছিলেন এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা (নিয়াত) করে নেয়ার পর তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মনে হয় এভাবেই তারা মুসলমান হয়েছিলেন।

যেসব সত্য সম্পর্কে প্রথম যুগের মুসলমানগণ পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন তার একটি এই যে, ইসলামী সমাজকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র আইনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। আল্লাহ্র আইন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সমাজ ইসলামী সমাজ হতে পারে না। ইসলামী সমাজ দীর্ঘকাল যাবত এ সত্যের উপর কায়েম ছিলো এবং এটাই ছিলো তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এসব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের এ স্বাতন্ত্র্য ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি পাঠকের নজরে পড়েছে। এমনকি যেসব প্রাচ্যবিদ ইসলামী সমাজকে শরীআতের আইন থেকে বিচ্ছিন্ন প্রমাণ করার এবং সুদৃঢ় ভিত্তিকে ধ্বসিয়ে দেয়ার অবিরত চেষ্টা করেছে তারাও ইসলামী সমাজের এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রাণশক্তিকে এবং ইসলামী সমাজের ভিত্তিমূলের সাথে তার গভীর সংযোগকে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। অধ্যাপক গীব তার Modern Trends in Islam গ্রন্থে লিখেছেন, "মানব গোষ্ঠীর কোন সম্প্রদায় নিজেদের জন্য যে সমাজ গঠন করে তার ধরন ও প্রকৃতি মৌলিকভাবে সেইসব আকীদা-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা এ জগতের অস্তিত্ব, এর উদ্দেশ্য এবং এখানে মানুষের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এটা সম্পূর্ণ পরিচিত মতবাদ, যা গীর্জাসমূহে প্রতি সপ্তায় বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু খুব সম্ভব ইসলাম কেবল একমাত্র ধর্ম যা সমাজকে এ মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করেছে। এ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তার কাছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল শরীআত"।

ভন গ্রুনিভম তার ইসলাম নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "যে জিনিসের পরিচয় লাভ করার জন্য প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরা শত শত বছর ব্যয় করেছে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক বছরের মধ্যে পেয়ে যান। তা এই যে, পার্থিব জীবনে কিছুকাল যমীনের বুকে কায়েম থাকাটা যখন আল্লাহ্র ইচ্ছার ফল তখন তাঁর জামাআতের (ইসলামী সমাজ) এ সময়ে তার জীবন আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর শিক্ষা অনুযায়ী অতিবাহিত করাও জরুরী। এ কারণে ইসলামী জামাআতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এ-ই ছিল যে, আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর আলোকে সে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান তৈরি করবে যার মধ্যে মানবজীবনের সার্বিক দিক (জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অর্থাৎ সে বিধানে জীবনের চিন্তাগত, বস্তুগত, আদর্শগত ও কর্মগত সব দিকই অন্তর্ভূক্ত হবে। এতে জীবনের পার্থিব ও পরকালীন দিকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। তা এই জীবনের

যাবতীয় সমস্যাকে দীনের বন্ধনে আবদ্ধ করবে এবং জীবনের যাবতীয় কাজ. তার ধরন ও প্রকৃতি যাই হোক, দীনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। এ কর্মপন্থা শুধু বাস্তব জীবনেই এক ধরনের অখণ্ডতা সৃষ্টি করেনি, বরং গোটা জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সমস্যার সমাধানও দীনের নীতিমালার আলোকে হওয়ার কারণে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমূলক কাজের সমষ্টি হিসাবে গড়ে উঠবে এমন কোন কর্মপন্থা ছিলো না, বরং ইসলামী সমাজকে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র একটি দৃষ্টান্তমূলক সমাজ হিসাবে গড়ে তোলাও অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হয়। সুতরাং প্রথম যুগের মুসলমানদের পরিভাষায় রাষ্ট্র, সামরিক বাহিনী ও কোষাগার (বায়তুল মাল) সবই আল্লাহ্‌র রাষ্ট্র, আল্লাহ্‌র বাহিনী এবং আল্লাহ্‌র কোশাগার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।"

উইলফোর্ড ক্যান্টওয়েল স্মীথ তার Islam in Modern History গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "যেহেতু ইসলামী দুনিয়ার প্রথম ব্যতিক্রমধর্মী নিদর্শন এই যে, তা মূলতই ইসলামী, এজন্য আমরা প্রথমে এখানে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, মূলত ইসলামের অর্থ কি"? অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে এ পুস্তকে 'ইসলাম এবং ইতিহাস' অধ্যায়ে (পৃ. ২৬-২৭) তিনি লিখেছেন, "ইসলাম সম্পর্কে গবেষণাকারীরা এটা অনুভব করেছেন যে, ইসলামের অধীনে একটি বিশেষ সমাজ গড়ে ওঠে। একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী সমাজের প্রতিটি বিভাগ পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। এ সমাজের সদস্যগণ পরস্পরের সাথে প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ এবং তা শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। অনেক লোক মনে করে নিয়েছে যে, ইসলামী জামাআত একটি সামাজিক সংগঠন নয়, বরং একটি ধর্মীয় সংস্থা। অথবা আমরা যদি পাশ্চাত্যের অনুপযোগী ব্যাখ্যা ব্যবহার করি তাহলেও আমরা বলতে পারি, এ সমাজে ধর্ম ও রাষ্ট্র একই জিনিস। ইসলামী সমাজ অন্যান্য সমাজের মতো কোন বন্ধুত্ব ও রসম-রেওয়াজের সমষ্টি মাত্র নয় অথবা আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের একটি পরিপাটি ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের সংযুক্তি নয় এবং তা কোন উন্নত ও অতুলনীয় মতবাদের ফলও নয়, বরং ইসলামী সমাজ তার সদস্যদের গভীর ঈমান ও আত্মপ্রত্যয়ে পরিপুষ্ট জীবনের দ্বারা গতিশীল একটি সমাজ। ঈমান ও একীনের উষ্ণতায় এই সমাজের প্রতিটি সদস্য অভিভূত। আমরা যদি 'দীন'কে ব্যক্তিগত 'ধর্ম' অর্থে ব্যবহার করি (যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে) তাহলে আমরা বলতে পারি, এ সমাজ অথবা

জামাআতই হচ্ছে ধর্মের সর্বোচ্চ, সর্বোন্নত ও অতুলনীয় মতবাদের ব্যাখ্যাতা। যদি কোন আকীদা-বিশ্বাস অথবা ধর্মীয় ব্যবস্থা ব্যক্তিগত আকীদার আকারে বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যার রূপ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে যে সামগ্রিক ব্যবস্থা যা জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সমষ্টি, তা বাস্তব ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা"।

এ ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের আরো উদ্ধৃতি পেশ করার প্রয়োজন নেই। কারণ সব প্রাচ্যবিদ ইসলামের অর্থ এবং ইসলামের ইতিহাসের এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, ইসলামী সমাজ ইসলামের আকীদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ও এ আকীদার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ইসলামী সমাজকে তার আকীদা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বরং এ আকীদা প্রতিটি ব্যক্তির আচার-ব্যবহারে প্রতীয়মান দেখা যায়। এই আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপক বিধান প্রতিটি ব্যক্তি ইসলামের আইন-বিধান থেকে গ্রহণ করে, যা জীবনের সার্বিক দিকে পরিব্যাপ্ত। প্রথম যুগের মুসলমানদের মতে ইসলামের একটি তাৎপর্যগত বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ইসলামের কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যতক্ষণ ইসলামী শরীআত অনুযায়ী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার এবং শরীআত থেকে এই সমাজের বিচ্যুতিকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমান চেষ্টা না করবে ততোক্ষণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

এ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারার ফল এই হয়েছিল যে, তারা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে ইসলামী আইনের অধীন মনে করতেন। তারা কখনো এরূপ চিন্তা করেননি যে, ইসলামী শরীআত কেবল ইবাদত-বন্দেগী পর্যন্ত অথবা কেবল বিবাহ, তালাক, দাসমুক্তি ও উত্তরাধিকারের ব্যক্তিগত ব্যাপার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বরং তারা মনে করতেন, ইসলামী শরীআত এমন সব ব্যাপারকেই নিজের আওতাভুক্ত করে, কখনো ইসলামী সমাজে যার উদ্ভব হতে পারে।

ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বত্বাধিকার, বন্ধক, ভাড়ার বিনিময়ে দেয়া-নেয়া, ঋণ প্রসংগ, বরং এমন সব সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক লেনদেন যা দুই ব্যক্তির মধ্যে অথবা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অথবা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে, তার জন্য ইসলাম আইন তৈরি করে এবং সব ব্যাপার

তদনুযায়ী মীমাংসিত হয়। অতএব ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল ঘোষণা করেছে এবং সূদ, মজুতদারি, আত্মসাৎ, একচেটিয়া কারবার, জোরপূর্বক দখল, ভেজাল, প্রতারণা ও জুলুমকে হারাম ঘোষণা করেছে। অনুরূপভাবে পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে যাওয়া এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যের সম্পদ থেকে বঞ্চিত রাখা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামের নির্দেশ এই যে, রাষ্ট্রে যাকাত আদায় করে তা কুরআনের নির্ধারিত খাতসমূহে ব্যয় করবে, বাইতুল মালের (রাষ্ট্রীয় আয়) উৎস নির্ধারণ করে জনগণের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে সামাজিক সুবিচারের নীতিমালা তৈরি করে তা অনুসরণ করবে। তবেই এই রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের সীমা নির্দেশ ইত্যাদি কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার আলোকে করা হয়েছে। এভাবে শূরা বা পরামর্শ পরিষদের মৌলিক নীতিমালা প্রণীত হলে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা, যতক্ষণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকে, বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন প্রথম খলীফা হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) পরিষ্কার ভাষায় এই আনুগত্যের সীমা নির্দেশ করেছেন ঃ

اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ فِيْكُمْ فَاِنْ عَصَيْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ ـ

"আমি যতোক্ষণ তোমাদের যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করতে থাকবো, তোমরাও আমার আনুগত্য করতে থাকবে। আর আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করি তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক না"।

হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর এই বক্তব্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে গৃহীত ঃ

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ـ

"সৃষ্টির যে নির্দেশে স্রষ্টার নাফরমানী হয়, সেই নির্দেশের আনুগত্য করা জায়েয নয়" (আহমাদ, হাকেম)।

ইসলামী শরীআতে ফৌজদারী আইনের জন্যও পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ বিধান মওজুদ রয়েছে। যেমন নরহত্যা, যেনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, শরাবপান, ধর্মত্যাগ, বিদ্রোহ ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে ইসলাম 'হদ্দ' নামে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 'তাযীর' নামে শাস্তি কার্যকর করে। এসব অপরাধের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রেও সুন্নাতে নববীর দৃষ্টান্ত ও বাস্তব ব্যাখ্যাকে সামনে রাখা হয়। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَدْرِئُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ

"সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেলে শাস্তি রহিত করে দাও"।

অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার পর যদি সে তওবা করে এবং অপরাধবৃত্তি পরিত্যাগের ঘোষণা দেয় তাহলে সমাজে তাকে পুনর্বার কাজকর্ম করার সুযোগ করে দেয়া হয়, অপরাধ করার কারণে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় না এবং সৎভাবে জীবন যাপন করার পথও বন্ধ করে দেয়া হয় না।[১]

ইসলামী শরীআত সামাজিক রীতিনীতি, বৈঠকি শিষ্টাচার এবং পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের আদব-কায়দার সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। অতএব পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা এবং সৎকাজ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত সমাজের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে ইসলামী সমাজে নারী-পুরুষের দৈহিক ও আত্মিক সম্পর্কের সীমা ও তার ধরনও পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যেমন, মহিলারা কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে অথবা কি ধরনের পোশাক পরিহার করবে, নিজেদের দেহের কোন কোন অংশ অনাবৃত রাখতে পারে এবং কি পরিমাণ অংশ আবৃত করে রাখতে হবে ইত্যাদি। ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনের (Private Life) যে শিষ্টাচার শিখিয়ে দিয়েছে তার ফলে সমাজের পবিত্রতাও সংরক্ষিত হতে পারে, তা সুস্থ

---

১. ইসলামী আইনের অধীন শাস্তির ধরন, এই শাস্তি সব যুগের লোকের জন্য উপযুক্ত হওয়া এবং এক্ষেত্রে সব সময় আদল-ইনসাফের নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যাপারে অবগতি লাভের জন্য আমার 'আল-ইনসানু বাইনাল মাদ্দিয়াতে ওয়াল ইসলাম' গ্রন্থের 'অপরাধ ও তার শাস্তি' অনুচ্ছেদ এবং আমার 'কাবসাতু মিনার রাসূল' গ্রন্থের 'আদরিউল হুদূদা বিশ-শুবুহাত' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য (লেখক)।

মানসিকতার সাথেও সামঞ্জস্যশীল এবং তার মাধ্যমে নিষ্কলুষ ও উন্নত জীবনের দাবিও পূর্ণ হতে পারে।[২] এভাবে ইসলামী শরীআত মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যা ও বিষয়াদি নিজের আওতাভুক্ত করে নিয়েছে।

প্রথম যুগের মুসলমানগণ একথা ভালোভাবেই বুঝতেন যে, জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের একমাত্র উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া শরীআত। এ ছাড়া অন্য কোন উৎস নেই। এই জমীনের বুকে মানব জীবনকে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল রাখা এই আইন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়।

আল্লাহ্‌র উপর অবিচল ঈমানের দাবিও মূলত তাই। অন্যথায় হৃদয়ের গভীরে অবতীর্ণ পরিপক্ক ও সঠিক ঈমানের কি অর্থ হতে পারে, যদি আল্লাহ্‌র এই ফরমানকে সত্য বলে স্বীকার করে না নেয়া হয় যা তিনি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং যার মূল বক্তব্য এই যে, আল্লাহ মানুষের উপকারের জন্যই এই আইন রচনা করেছেন। এজন্য তিনি এই আইনের বাস্তবায়নকে অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করেছেন। যেসব লোক আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান কার্যত বলবৎ করে না তারা কাফের, ফাসেক ও জালেম। এমন সাচ্চা পরিপক্ক ঈমানের কি মূল্য আছে যদি আল্লাহ্‌র এই বাণীর সত্যতা স্বীকার করা না হয় যে, আল্লাহ প্রদত্ত আইন ছাড়া যতো আইন রয়েছে তা মানুযেব অধিকার আত্মসাৎকারী একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লালসা-বাসনার অধীন। কেবল আল্লাহ্‌র আইনই সত্য। কেননা তা তাঁর নাযিলকৃত বিধান যিনি জালেমও নন এবং প্রবৃত্তির অনুসারীও নন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র উপর এমন পাক্কা ঈমানের কি অর্থ হতে পারে যদি মুসলমানদের অন্তরে এই ধারণা থাকে যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় উত্তম (নাউযুবিল্লাহ)?

অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র উপর এমন নির্ভেজাল ঈমানের অর্থ কি হতে পারে যদি মুসলমানদের অন্তরে এই ধারণা আসতে থাকে যে, বিশ্ব প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামের ব্যাপক বিধান কেবল আরব উপদ্বীপের একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবনের সীমিত পরিসরের জন্য

২. ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী এবং এ সম্পর্কে ইসলামের সমাধান বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আমার 'আল-ইনসানু বাইনাল মাদ্দিয়াতি ওয়াল ইসলাম' গ্রন্থের 'আল-মুশকিলাতুল জিনসিয়া' অনুচ্ছেদ এবং আমার অন্য পুস্তক 'মাআরিকা ও তাকালীদ' দ্রষ্টব্য।

উপযুক্ত ছিল এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশা পর্যন্তই তাদের মধ্যে বলবৎ ছিলো? অথচ কুরআন মজীদ এই আইন সম্পর্কে বলছে যে, তা গোটা মানবজাতির জন্য নাযিল করা হয়েছে ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ·

"এতো গোটা বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশমালা" (সূরা সাদ ঃ ৮৭: সূরা তাকবীর ঃ ২৭)।

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ·

"অতীব বরকতময় সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দার উপর ফোরকান (মানদণ্ড) নাযিল করেছেন যেন তা সমগ্র জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হয়" (সূরা ফোরকান ঃ ১)।

কুরআন বলে যে, এই কিতাবে মানবজাতির জন্য যে আইন-বিধান নাযিল করা হয়েছে তা সত্য, সঠিক ঃ

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ·

"এই কুরআন আমি সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্যতা সহকারেই তা নাযিল হয়েছে" (সূরা ইসরা ঃ ১০৫)।

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ ·

"আল্লাহ তো আকাশমণ্ডলী ও জমীন সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তা এজন্য করেছেন যে, প্রতিটি প্রাণীকে যেন তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া যায়। লোকদের উপর কখনও যুলুম করা হবে না" (সূরা জাসিয়া ঃ ২২)।

সত্য শরীআত যেন সেই বিধান যার দাবির প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়ে থাকে এবং এটা সেই সত্য যার উপর আল্লাহ জমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। এই সত্য কেবল আরব উপদ্বীপের সীমিত এলাকার আংশিক সত্য নয় এবং তা কেবল সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সাময়িক সত্য নয়,

যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কেননা আল্লাহ কুরআন মজীদের সবশেষে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের একটি আয়াতে গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ․

"আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করেছি" (সূরা মাইদা ঃ ৩)।

যদি কোন মুসলমানের মনে উল্লিখিত কথাগুলোর কোন একটি কথার সত্যতা সম্পর্কে সামান্যতম সংশয় জাগে অথবা সে যদি দীনে হকের কোন একটি সত্য সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করে তাহলে তার আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার কি অর্থ দাঁড়ায় ? সুষ্ঠু চিন্তার অধিকারী কোন মুসলমান এহেন দুঃসাহস করতে পারে না।

ইসলামী শরীআত নাযিল হওয়ার পর চৌদ্দ শত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানব সভ্যতা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। মানুষ দর্শনের সাথে পরিচয় লাভ করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেছে, রাষ্ট্র বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু সেইসব বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, জমীনের অধিবাসীদের প্রণীত প্রতিটি আইন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রবৃত্তির প্রতিচ্ছবি হয়ে বিরাজ করছে এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অসৎ উদ্দেশ্য ও হীন স্বার্থ চরিতার্থ হতে থেকেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি জমিদারী ব্যবস্থা চালু থাকে তাহলে ক্ষমতাসীন মহল অন্যদের স্বার্থ উপেক্ষা করে কেবল জমিদারদের স্বার্থের অনুকূলে আইন প্রণয়ন করেছে। যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে ক্ষমতাসীনরা শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে পুঁজিপতিদের স্বার্থ বিবেচনা করে পুঁজিবাদী আইন প্রণয়ন করেছে। যদি শ্রমিকদের একনায়কত্ব কায়েম হয়ে যায় তাহলে তারা

অন্ততপক্ষে তাত্ত্বিক দিক থেকে এমন আইন প্রণয়ন করে যেখানে অন্যদের স্বার্থের প্রতি নজর না রেখে শুধু শ্রমিকদের স্বার্থ সামনে রাখা হয়েছে (যদিও বাস্তব অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত)। অন্তত আজ পর্যন্ত ইতিহাসে তাই ঘটেছে।

এই সত্যকে আল্লাহ কুরআন মজীদে একটি মূলনীতির আকারে বর্ণনা করেছেন যে, গাইরুল্লাহ্‌র প্রণীত প্রতিটি আইন هَوًى অর্থাৎ নফসের খাহেশের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে। কু-প্রবৃত্তির তাড়না যে দিকে মোড় নেয় আইনও সেদিকে নিজের গতি পরিবর্তন করে।

ইসলামী শরীআত নাযিল হওয়ার চৌদ্দ শত বছরে মানবজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এই অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যখন এবং যেখানে মানুষ আল্লাহ্‌র বিধান থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তার ফল অসহনীয় তিক্ততা ও দুর্ভাগ্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এতে মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এর পরিণাম হচ্ছে আধুনিক ইতিহাসের বিশ্বব্যাপী দুর্ভাগ্য, যার কারণে শুধু চতুর্দশ হিজরী শতকে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসের ভয়াবহ ধ্বংসকারিতা নিজের বক্ষে ধারণ করে মানবতার দরজায় করাঘাত করছে। আর এরই ফলস্বরূপ পারিবারিক জীবন খতম হয়ে গেছে, নৈতিক বন্ধন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, মতবাদের দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্রী এতোটা নিকৃষ্টভাবে থেতলে দেয়া হয়েছে যে, এই যুগে যে হারে মস্তিষ্ক বিকৃতি, মানসিক ও স্নায়বিক বৈকল্য, খুনখারাবী, আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে, মানব ইতিহাসে গোটা সময়-কালের তথ্য একত্র করলেও তা এর সমপরিমাণ হবে না।

প্রথম যুগের মুসলমানগণ যদিও আমাদের মত দার্শনিক ছিলেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এ সত্য সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, মানুষের মেজাজের মধ্যে দুই ধরনের উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। তার একটি হলো স্থায়ী (একই অবস্থার উপর স্থির থাকে)। আর অপরটি পরিবতর্নশীল (অনবরত বদলাতে থাকে)। এই সৃষ্টিগত মিশ্রণে মানবদেহে এই দু'টি উপাদান পরস্পর একাত্ম হয়ে গেছে। তারা একথা জানতেন যে, মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র নির্ধারিত চিরস্থায়ী আইন মানব ইতিহাসের সমস্ত অধ্যায়ে মানব মেজাজের এই দু'টি (পরিবর্তনশীল

ও স্থায়ী) উপাদানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থেকেছে। এই আইন দীন এবং আল্লাহ্র উপর দৃঢ় বিশ্বাস, এই দু'টি উপাদানকে পরস্পরের সাথে শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে।

মানব দেহের অপরিবর্তনশীল উপাদান সেসব চিরস্থায়ী সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা মানব সৃষ্টির মধ্যে শামিল রয়েছে এবং পরিবেশ ও স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন'এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেমন মানবজাতির সৃষ্টি আল্লাহ্র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ·

"যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি অবশ্যই জমিনের বুকে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে চাই" (সূরা বাকারা ঃ ৩০)।

আবার যেমন বলা হয়েছে সমস্ত মানুষ একটিমাত্র আত্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছেঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ·

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি একটিমাত্র আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন" (সূরা নিসা ঃ ১)।

অথবা সেই একটি আত্মা থেকে আল্লাহ তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যার সাথে সে মিলেমিশে বসবাস করে অথবা যে তার সংগিনী ঃ

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ·

"তিনি তোমাদের একটিমাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই প্রাণ থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন" (সূরা নিসা ঃ ১)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ·

"তাঁর নির্দশনসমূহের মধ্যে এও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতির মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেনো তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন" (সূরা রূম ঃ ২১)।

অতঃপর তিনি সেই আত্মা ও তার স্ত্রী থেকে গোটা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন ঃ

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ·

"তিনি তোমাদের একটিমাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, আর এই দম্পতি থেকে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন" (সূরা নিসা ঃ ১)।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

"হে মানবজাতি! আমরা তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেনো তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)।

এই চিরন্তন সত্য থেকে আরো কতোগুলো সত্য বেরিয়ে আসে এবং সেগুলোও চিরন্তন। যেমন ঃ

একটি সত্য এই যে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক নিজের ক্ষুদ্র ও নগণ্য সত্তার সামনে মহান আল্লাহ্র বিরাটত্ব ও ব্যাপকত্বকে অনুভূতির মাধ্যমে ধরে রাখবে, তাঁরই ইবাদত করবে এবং জীবনের যাবতীয় কাজকর্মে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে।

দ্বিতীয়ত; স্বামী-স্ত্রী, যাদের আল্লাহ একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, নিজেদেরকে একদেহ মনে করবে এবং পরস্পর প্রেম-প্রীতির ডোরে আবদ্ধ থাকবে। তারা অনুভব করবে যে, তারা যখন ভালোবাসা ও মমতা সহকারে একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করবে তখনই তাদের অস্তিত্বে পূর্ণতা আসতে পারে।

তৃতীয়ত, মানবজাতির অন্তরাত্মা যতক্ষণ পূতপবিত্র থাকবে ততক্ষণ তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জীবন্ত থাকবে। কেননা তারা একই সত্তা থেকে সৃষ্ট এবং

তারা পরস্পরের আত্মীয়। এরই ভিত্তিতে ভালো ও কল্যাণকর কাজে তারা একে অপরের সহযোগিতা করবে। এই সত্যগুলো অপরবর্তনীয়। কারণ তা স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও কেন্দ্রীভূত।

কিন্তু এর সাথে সাথে এমন কতগুলো সত্যও রয়েছে যা পরিবর্তনশীল। তা পরিবর্তিত হওয়ার কারণ এই যে, মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অহরহ বিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং মানব-বুদ্ধি ও বিশ্বের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের ধারা অব্যাহত আছে। মানব-জ্ঞান বিশ্বের যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটনে উদগ্রীব, তার অভ্যন্তরের সমস্ত সম্পদ হস্তগত করার প্রত্যাশী এবং নিজের কল্যাণের জন্য গোটা দুনিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট। এরই ফলস্বরূপ জীবনের নতুন নতুন মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ও আচরণের উন্মেষ ঘটছে। মানুষ গ্রাম্য জীবন থেকে শহরের ভদ্র ও সভ্য জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কৃষি পরিত্যাগ করে শিল্প ও কারিগরী পেশার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে এবং এ থেকে আরো সামনের দিকে অগ্রসর ... ...।

ইসলাম যেহেতু একটি স্বভাব-সুলভ ধর্ম, তাই সে মানবতার এই দু'টি দিককেই ঐক্যসূত্রে গেঁথে নিয়েছে। সে মানবজাতির অপরিবর্তনশীল দিকটির জন্য স্থায়ী বিধি প্রণয়ন করেছে এবং পরিবর্তনশীল দিকটির জন্য কয়েকটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র ভিত্তি নির্ধারণের পর তার সীমার মধ্যে অবস্থান করে বিবর্তনের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। যাতে উভয় অবস্থায় এই বিধান বিশ্ব-প্রকৃতি ও জীবন-প্রকৃতির সাথে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারে।

মানবতার অপরিবর্তনশীল দিকের জন্য ইসলাম আকীদা-বিশ্বাস দান করেছে। আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন একটি অপরিবর্তনশীল একক। কারণ তা অপরিবর্তনশীল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আকীদা-বিশ্বাসের পাশাপাশি ইসলাম বিবাহ-তালাকের আইন, হুদূদ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার আইনও প্রণয়ন করেছে। যেহেতু বিবাহ-তালাক অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি অপরিবর্তনশীল উপাদান, তাই এর জন্য স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল বিধান বিদ্যমান রয়েছে। কারণ এই সম্পর্ক যেসব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাও অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ (১) পুরুষ (২) স্ত্রী এবং (৩) সেই গভীর সম্পর্ক (মমত্ব ও ভালোবাসা) যা উভয়কে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করার এবং উভয়কে একত্রে সংযুক্ত রাখার কারণ হিসাবে গণ্য।

জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও উপায়-উপকরণ সদা পরিবর্তনশীল। সমাজেও অহরহ পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু এর কোনটিই মানুষের স্থায়ী

প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে পারে না, শারীরবৃত্ত, জীবনীশক্তি, গ্রন্থিসমূহ ও রাসায়নিক উপাদানের ক্রিয়া তাদের মধ্যকার স্বাতন্ত্র অক্ষুন্ন রাখে। যেমন পুরুষ পুরুষই থেকে যাচ্ছে এবং নারীর মধ্যে নারী সুলভ বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। কিন্তু তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুখাপেক্ষীহীন হতে পারছে না।[৩]

অনুরূপভাবে 'হুদূদ' প্রসংগ অর্থাৎ বিশেষ কতিপয় অপরাধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শাস্তি, যা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর কার্যকর করা বাধ্যতামূলক। তা এমন একটি মৌলিক উপাদান যার মধ্যে পরিবর্তন সূচীত হতে পারে না, কেননা তার ভিত্তিও অপরিবর্তনশীল। আর তা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পর্ক এবং সম্মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তার মূলনীতি। এর দাবি হচ্ছে ঃ একে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না।

জীবনের অবস্থা পরিবর্তনশীল। কর্মের সম্পর্ক ও সৃষ্ট উপায়-উপকরণও পরিবর্তিত হতে থাকে। যন্ত্রশক্তির সাথে মানুষের সম্পর্ক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাও সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু এর কোন জিনিসই সেই অপরিবর্তনশীল সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না যাকে মানবজাতির ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। তা এই যে, গোটা মানবজাতি একটিমাত্র আত্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই আত্মিক সম্পর্ক সবাইকে একত্রে বেঁধে রেখেছে।[৪]

---

৩. আমি আমার 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম' গ্রন্থের 'ইসলাম ও নারী' প্রবন্ধে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ইসলামে তার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা সেখানে বলেছি যে, ইসলাম কিভাবে এই সমস্যা পরিপূর্ণ ইনসাফ সহকারে সমাধান করেছে এবং তার সাথে বিবর্তনের ধারার কোন সংঘর্ষ নেই আর না বিবর্তনের ধারা তাতে কিছু যোগ করতে পারে। কিন্তু বিবর্তন বলতে যদি নৈতিক বিপর্যয় ও নারী-পুরুষের মধ্যে কৃত্রিম সমতা মনে করা হয়, তবে তার জন্য ইউরোপে তার কিছু পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও দাবি রয়েছে, যার সাথে মানবজাতির প্রকৃত মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক নেই।

৪. বস্তুবাদ ও মার্কসীয় দর্শনের প্রবক্তাগণ বলেন যে, এই আত্মিক সম্পর্কের মূলত কোন অস্তিত্ব নেই। যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব আছে কেবল সেই সমাজে তার অস্তিত্ব আছে। যদি ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে দেয়া যায় তবে এই সম্পর্কের ভিত্তিতে যেইসব আইনগত বিধান গড়ে উঠে তাও আপনা আপনি খতম হয়ে যাবে।এ কথা যদি বা সত্যও হয় তবে এর কি করা যাবে যে, স্বয়ং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন শুরু করেছে এবং যেসব ত্রুটি রয়ে গেছে তাও অচিরেই পূর্ণতা লাভ করবে ?

অনুরূপভাবে কতিপয় তমদ্দুনিক বিষয়ও অপরিবর্তশীল প্রকৃতির। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা-বন্ধক, ঋণ, প্রতিনিধিত্ব (ওকালা) ইত্যাদি। এসব বিষয়েও যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তাও অপরিবর্তনশীল। অনুরূপভাবে যুদ্ধ ও সন্ধী চলাকালে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের বিধানও অপরিবর্তনশীল প্রকৃতির। এখন জীবনের অপরিবর্তনশীল দিকের সাথে পরিবর্তনশীল দিকের সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা দাবি রাখে। যেমন রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং সমাজ ও পরিবেশের বিচিত্র প্রকৃতি, যেমন গ্রাম্য জীবন, কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরী ইত্যাদি। এগুলো এমন জিনিস যা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কার্যকরণ জগতের পারস্পরিক আচরণের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও এসব জিনিস নিজস্ব অপরিবর্তনশীল ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভবও নয়। কেননা গোটা মানবজাতি স্বয়ং একটি একক এবং পরস্পরের সাথে নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ। এর মূল্যায়নও সম্ভব নয় এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে ইসলামের কর্মপন্থা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব ইসলাম এসব ব্যাপারে পথ প্রদর্শনের জন্য মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়, কিন্তু আনুষংগিক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ নির্দিষ্ট করেনি। অথবা বলা যায়, ইসলাম বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের একটি কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে। এর আওতায় অবস্থান করে মানুষ যতোদূর ইচ্ছা উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আর এটা ভবিষ্যত বংশধরদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের মেজাজ, নিজেদের বস্তুগত অবস্থা, নিজেদের জ্ঞান এবং নিজেদের আবিষ্কৃত উপায়-উপকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিশেষ নকশা প্রণয়ন করে নিবে। তবে শর্ত হচ্ছে, এই নকশা যেনো ইসলামের নির্মিত কাঠামো অতিক্রম না করে এবং তা এতো ক্ষুদ্রও যেনো না হয় যে, এই কাঠামোর অনেক জায়গা খালি পড়ে থাকবে।

রাষ্ট্র ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম দু'টি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে ঃ আদল (ন্যায়-ইনসাফ) ও শূরা (পরামর্শ পরিষদ)।

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

"তোমরা যখন লোকদের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়-ইনসাফের স ফয়সালা করবে" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)।

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ·

"তারা নিজেদের যাবতীয় বিষয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করে" (সূরা শূরা ঃ ৩৮)।

কিন্তু ইসলাম শূরার কোন বিশেষ পন্থা নির্ধারণ করে দেয়নি যে, তা এক কক্ষ বিশিষ্ট হবে না দুই কক্ষ বিশিষ্ট, নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য নেয়া হবে না মনোনয়ন দেয়া হবে, প্রতিনিধিত্বশীল হবে না পেশা ভিত্তিক ইত্যাদি। পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সমতা বিধানের জন্য এসব ব্যাপার অভিজ্ঞতা ও ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক বিষয়েও কতগুলো মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যাতে সবাই সম্পদের শরীকানা লাভ করতে পারে এবং কেউই যেন বঞ্চিত না থাকে। কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছে যে, সম্পদের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি মানুষকে তা ভোগ করার অধিকার দিয়েছেন ঃ

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ·

"তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং তিনি যেসব ...সর উপর তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করো" ...দীদ ঃ ৭)।

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتَاكُمْ ·

...হ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাদেরকে দাও" ...৩)।

...ন ঘোষণা করেছে যে, সম্পদের প্রথম হকদার হচ্ছে ... প্রত্যেক সদস্য নিজের ভূমিকা অনুযায়ী এই সম্পদের অধিকারী ...দি সন্তোষজনক না হয় তবে এই সম্পদ পুনরায় সমাজের

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَ...

...াহ তোমাদের জীবন ধারণের উপায় বানিয়েছেন তা ...না" (সূরা নিসা ঃ ৫)।

...থে

কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়বে এবং সামগ্রিকভাবে জাতি তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

كَيْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ·

"সম্পদ যেন তোমাদের মধ্যকার ধনী লোকদের কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে" (সূরা হাশর ঃ ৭)।

গরীবদের নির্ধারিত অধিকারের ভিত্তিতে সম্পদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। জাতীয় সরকার তা আদায় করে বঞ্চিতদের মধ্যে বণ্টন করবে।

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا ....

"এই সদকা (যাকাত) মূলত ফকীর, মিসকীন এবং তা আদায়কারীদের জন্য.... .... " (সূরা তওবা ঃ ৬০)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِىْ ثَلاَثٍ اَلْمَاءِ وَالْكَلاَءِ وَالنَّارِ ·

"তিনটি জিনিসের মধ্যে সব লোক সমান অংশীদার ঃ পানি, ঘাস ও আগুন" (মাসাবীহুস সুন্নাহ)।

তিনি আরো বলেন ঃ

لَاَنْ يَّمْنَعَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَرْضَهُ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَنْ يَاْخُذَ خَرَجًا مَّعْلُوْمًا ·

"তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি নিজের জমি তার কোন ভাইকে কোনরূপ বিনিময় ছাড়া চাষাবাদ করতে দেয় তবে এটা তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণের তুলনায় অতি উত্তম" (বুখারী)।

হযরত উমার ফারূক (রা) বলেন ঃ

لَوْلاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ اِلاَّ قَسَّمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَا كَمَا قَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ·

"যদি পরবর্তী কালে আগত মুসলমানদের কথা খেয়াল না করা হতো তাহলে অবশ্যই আমি প্রতিটি বিজিত গ্রাম সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খয়বার এলাকা বণ্টন করেছিলেন" (বুখারী)।

ইসলাম সম্পদে সমষ্টিকে যে অধিকার দিয়েছে তাতে সমষ্টির সদস্যদের অংশীদারিত্বের কোন বিশেষ পন্থা নির্ধারণ করেনি। জনকল্যাণমূলক সম্পদে ব্যক্তিকে মালিক বানানোর পরিবর্তে তাকে যৌথ সম্পত্তি ঘোষণা করা হবে অথবা সদস্যদের মূল পুঁজিতে অংশীদার বানানো হবে অথবা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে, তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ وَلِّى لَنَا عَمَلاً وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلاً اَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَّخِذْ زَوْجَةً اَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا اَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً ·

"যে ব্যক্তি আমাদের (সরকারের) দায়িত্বভার গ্রহণ করে, যদি তার বাসস্থান না থাকে তবে সে একটি বাসস্থান নিতে পারে। যদি তার স্ত্রী না থাকে তবে সে একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। যদি তার খাদেম না থাকে তবে সে একজন খাদেম গ্রহণ করতে পারে অথবা যদি তার বাহন না থাকে তবে একটি বাহন গ্রহণ করতে পারে" (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)।

এসব ক্ষেত্রে ইসলাম কোন বিশেষ নীতি নির্ধারণ করে দেয়নি এবং অনাগত বংশধরদের জন্য এই অবকাশ রাখা হয়েছে যে, তারা নিজেদের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো বেছে নিবে। এজন্য ইসলাম এসব বিষয়ের কোন স্থবির বা অপরিবর্তনশীল ব্যাপক নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেনি, যাতে তা সমাজের বিবর্তন এবং অনবরত পরিবর্তনশীল কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হয়ে না দাঁড়ায়। সাথে সাথে ইসলাম এসব ক্ষেত্রে অপরিবর্তনশীল মূলনীতির সীমা থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ারও

অনুমতি দেয়নি। ইসলাম এই দাবি করার সুযোগও দেয় না যে, লোকেরা বিনা প্রমাণে বলবে, তারা নিজেদের ব্যাপারগুলো সবচেয়ে বেশী ভালো বোঝে, অতএব তারা বুনিয়াদী মূলনীতিগুলোও বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে স্বেচ্ছাচারিতার পরিণতি এতই ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে, যার ফলে উন্নতিশীল মানবতার মুখ লজ্জায় মলীন হয়ে গেছে। ইউরোপে প্রথমে সামন্ততন্ত্র চালু ছিল, অতঃপর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রবর্তন হলো। এই দু'টি ব্যবস্থা মানুষের উপর যে শোষণ ও নির্যাতন চালিয়েছে তা কোন গোপন ব্যাপার নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই দু'টি ব্যবস্থাই নাজায়েয। কেননা উভয় অবস্থায় সম্পদ, জমি হোক অথবা পুঁজি, শুধু ধনিক শ্রেণীর চারপাশে আবর্তন করে এবং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বঞ্চিত থেকে যায়। অতঃপর এই দু'টি ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার দাবি নিয়ে সমাজতন্ত্র এগিয়ে এলো যার অর্থ হচ্ছে, মুখ বুঝে রাষ্ট্রের গোলামী করে যাওয়া এবং জনগণের উপর একনায়কত্ব চেপে বসা।

ইসলাম পৃথিবীর গোটা মানবজাতির জন্য এবং মানুষের প্রতিটি বংশ, গোত্র ও সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্‌র পয়গাম। তার মধ্যে এমন কোন পরিবর্তনের অবকাশ নেই যার ফলে মানুষ জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। যদিও ইসলাম যে কোন ধরনের ক্রমবিকাশ এবং সংগতিপূর্ণ আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি গ্রহণ করার অনুমতি দেয়, কিন্তু কদমে কদমে সে মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে, যাতে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে না যায় এবং যে কোন ক্ষেত্রে ও যে কোন অবস্থায় নিজের চিন্তার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করতে পারে।[৫]

প্রথম যুগের মুসলমানগণ এসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, যদিও তারা আমাদের মতো সমস্যাকে দর্শনে পরিণত করেননি। সুতরাং স্থায়ী ধরনের ব্যাপারসমূহে তাদের ফিক্‌হী অনুসন্ধান কুরআনের নির্দেশের ব্যাখ্যা এবং যেসব অবস্থায় এই নির্দেশ প্রযোজ্য হতে পারে সেই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। আর পরিবর্তনশীল বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে তাদের ফিক্‌হী অনুসন্ধান মূলনীতির হেফাজত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। এ ব্যাপারে হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)

---

৫. 'কুবসাত মিনার-রাসূল' গ্রন্থের 'আনতুম আ'লামু বি-উমূরি দুনয়াকুম' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বলতেন ঃ "যে পরিমাণ সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকবে, তার নির্দেশও (সমাধান) বের হতে থাকবে"।

প্রথম যুগের মুসলমানগণ ইসলামের অর্থের মধ্যে একথাও পেয়ে যান যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি মিলে একটি একক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَاسْتَطَاعَ اَلاَّ تَقُوْمَ حَتّٰى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا فَلَهُ بِذَالِكَ اَجْرٌ ۔

"যদি কিয়মাত এসে যায় এবং তোমাদের কারো হাতে চারাগাছ থেকে থাকে এবং সে তা রোপণ করার মতো সময় পেয়ে যায় তাহলে সে যেন তা রোপণ করে। কেননা সে একাজের জন্যও প্রতিদান পাবে"।[৬]

এ হাদীস থেকে সর্বপ্রথম যে কথা অনুধাবন করা যায় তা হচ্ছে, ইসলামী চিন্তার আশ্চর্যজনক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ দুনিয়ার পথ হচ্ছে মূলত আখেরাতের পথ। এই দুই প্রকার পথের মধ্যে কোন বিরোধ, কোন পার্থক্য নেই। ইসলামে এরূপ ধারণার অবকাশ নাই যে, এ দু'টি স্বতন্ত্র পথ, একটি দুনিয়ার এবং অপরটি আখেরাতের। বরং একই পথ যা দুই মঞ্জিলে পৌঁছে দেয় এবং দুই মঞ্জিলকে একত্র করে। এমন নয় যে, একটি পথ আখেরাতের জন্য, তার নাম হচ্ছে ইবাদত এবং অপরটি হচ্ছে দুনিয়ার পথ, তার নাম হচ্ছে পার্থিব কাজকর্ম। বরং একই পথ যার সূচনা হচ্ছে দুনিয়া থেকে এবং তা আখেরাতে গিয়ে শেষ হচ্ছে। এ এমন এক পথ যেখানে আমল থেকে ইবাদত এবং ইবাদত থেকে আমল পৃথক নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়টি একই জিনিস। উভয়ে মিলেমিশে এই একই পথে পাশাপাশি চলতে থাকে।

এখানে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমল জারী থাকে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তেও চারাগাছ রোপনের কাজ চলতে থাকে। ইসলামে আমাদের মূল্য ও মর্যাদার গুরুত্বের উপর জোর দেয়া এবং আমলের মাধ্যমে ঈমানের সাক্ষ্য

---

৬. আলী ইবনুল আযীয তাঁর 'মুন্তাখাব গ্রন্থে এ হাদীসটি হাসান বসরীর সনদে হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

পেশ করার ধারণা একান্ত পরিষ্কারভাবে মওজুদ রয়েছে। কিন্তু এখানে কেবল আমলের মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন পর্যন্ত শেষ করা হয়নি, বরং আমলই হচ্ছে মূলত আখেরাতের একমাত্র পথ।

অতীতে এবং বর্তমান যুগে মানবতার উপর এমনও সময় এসেছে যখন ধারণা করা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের পথ পৃথক পৃথক এবং এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, আখেরাতের সাফল্য লাভের জন্য দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। কেননা দুনিয়ার ব্যস্ততা আখেরাতকে বরবাদ করে দেয়।

এ বিভক্তি কেবল এখানে শেষ হয়নি, বরং দেহ ও প্রাণের মধ্যে বিভক্তি, জড় ও অজড় বিষয়ের মধ্যে বিভক্তি, দর্শনের পরিভাষায়, ফিজিক্স ও মেটাফিজিক্সের (অধিবিদ্যা) মধ্যে বিভক্তি, কর্মজীবন ও নৈতিক জীবনের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি সবই একটিমাত্র দৃষ্টিভংগী থেকে সৃষ্টি হয়েছে।অর্থাৎ দীন (ধর্ম) ও দুনিয়ার মধ্যকার বিভক্তি থেকেই এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

অথচ মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব নিজের সৃষ্টিগত ফিতরাতের দিক থেকে একটি একক, যার মধ্যে রক্ত, মাংস, জ্ঞান, জড়, অজড় সব একত্র হয়েছে। এর মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না, আকর্ষণ, জ্ঞানের চিন্তা-ভাবনা এবং আত্মার স্পন্দন সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানব দেহের এসব অংশ নিশ্চয় পরস্পর বিরোধী এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়। যদি এগুলোকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে এর প্রতিটি নিজ নিজ ঝোঁক-প্রবণতা অনুযায়ী বিচরণ করতে থাকবে।

কিন্তু মানব সত্তার মধ্যে একটি অদ্ভূত জিনিস এই যে, এই বিচ্ছিন্ন ও বিপরীতধর্মী অংশগুলোকে একত্র করে একটি এককে পরিণত করা যায়। এই অংশগুলো একটি সুদৃঢ় এককে সম্মিলিত হয়ে পৃথিবীর বুকে এক বিরাট শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এটা তখনই সম্ভব যখন এই নশ্বর মানুষ অবিনশ্বর শক্তি থেকে আলো গ্রহণ করে নিজেও আলোকিত হয় এবং আলোর মত স্বাধীন হয়ে বস্তু ও অবস্তুর পার্থক্য বিলীন করে দেয়। মানব দেহের এই বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিপরীতমুখী দিকগুলোকে ঐক্যবদ্ধ এবং একটি এককে সম্মিলিত করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ঃ দুনিয়া এবং আখেরাতকে একই মঞ্জিলের পথ বলে ঘোষণা করা।

এই অবস্থায় দীন ও দুনিয়া এক হয়ে যাবে এবং মানব জীবনে ইবাদত ও আমল এবং মানব সত্তায় দেহ ও প্রাণ দুইভাগে বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। আর জীবনের উদ্দেশ্য ও কাজ এবং মতাদর্শ অথবা বাস্তব ও দৃষ্টান্তের মধ্যে বিভক্ত হবে না।

দুনিয়া ও আখেরাতের পথ যখন এক হয়ে যায় তখন এই ঐক্য দেহের আভ্যন্তরীণ দুনিয়ায় প্রবেশ করে এবং পরস্পর বিপরীত দিকগুলো কাছাকাছি এসে পরস্পর মিলিত হয়ে যায়। ইসলাম এইভাবে দুনিয়া ও আখেরাতকে একটি ব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে দেখিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ·

"আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা দিয়ে আখেরাতের ঘর বানাবার চিন্তা করো, অবশ্য দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলো না" (সূরা কাসাস ঃ ৭৭)।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ·

"বলো, আল্লাহ্‌র সেইসব সৌন্দর্য অলংকার কে হারাম করেছে, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন এবং আল্লাহ্‌র দেয়া পাক জিনিসসমূহকে নিষিদ্ধ করেছে? বলো, এসব জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদার লোকদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন তো একান্তভাবেই তাদের জন্য হবে" (সূরা আরাফ ঃ ৩২)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত যেহেতু ইসলামী চিন্তাধারার বাস্তব ও পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা, তাই তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখেরাত একই পথ এবং দীন ও দুনিয়া একই জিনিস ছিলো।[৭]

ইবাদতের অর্থ

প্রথম যুগের মুসলমানগণ একথা হৃদয়ংগম করতে পেরেছিলেন যে, ইসলামে ইবাদতের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং তা জীবনের সার্বিক দিকে পরিব্যাপ্ত।

৭. 'কুবসাত মিনার-রাসূল' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

ইসলামের ইবাদত কেবল নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামে ইবাদতের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর এবং তা আল্লাহ্র সাথে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। আর এই সম্পর্ক হচ্ছে প্রশিক্ষণের পূর্ণাংগ পাঠ্যসূচী, যার মাধ্যমে জীবনে অন্য সব কাজের শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে।

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইবাদতের প্রদর্শনী মূলত ইবাদতের উদ্বোধনী বা ভূমিকা অথবা তা সফরকালীন বিরতি স্থান, যেখানে সফরকারীরা যাত্রা বিরতি দিয়ে নিজেদের পাথেয় সংগ্রহ করে, অন্যথায় গোটা পথই ইবাদত। এর মধ্যে যে পরিমাণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিধিবিধান রয়েছে, যতো কাজ অথবা চিন্তা-চেতনা রয়েছে, যতোক্ষণ তার উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে থাকে, তা সবই ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়। এই অর্থের দিক থেকে ইবাদত গোটা জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। অন্যথায় জীবনের কয়েকটি মাত্র মুহূর্তে যে বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠান আদায় করা হয় কেবল তাই ইবাদত হতে পারে না।। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ·

"আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি" (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)।

ইবাদতের এই প্রকাশ্য আনুষ্ঠানিকতার নামই যদি কেবল ইবাদত হতো, তাহলে বিশ্বের বুকে এই সামান্য কয়েকটি মুহূর্তের কোনই মূল্য ও মর্যাদা থাকতে পারে না, যা নিজের কোন প্রভাব না রেখেই শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। গোটা জীবনের কর্মপন্থা যখন ইবাদতে পরিণত হয় তখনই এই ইবাদতের মূল্য ও মর্যাদা হতে পারে। এই ইবাদত চিন্তা-চেতনা ও কর্মের এমন একটি সংবিধান হবে, যা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতিটি মুহূর্তের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কাজের বিস্তারিত বিবরণ জানা যাবে এবং এই যাবতীয় কাজের কেন্দ্রবিন্দু হবেন আল্লাহ্। প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর দেয়া সংবিধান থেকে পথনির্দেশ লাভ করতে হবে। অন্তর ও চেতনা এবং জ্ঞান ও কর্ম সবকিছুর জন্যই এখান থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে হবে।

ইসলামে ইবাদতের অর্থ মূলত তাই। ইবাদতের অর্থ কখনো এই নয় যে, মানুষ দুনিয়া পরিত্যাগ করবে অথবা প্রতিটি মুহূর্তে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের

নিয়মাবলী পালন করবে এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করবে। ইবাদতের অর্থ এও নয় যে, রুকূ ও সিজদার সময় তো অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ছেয়ে যাবে, কিন্তু যখন নামায শেষ হয়ে যাবে তখন অন্তরের জগত লোভ-লালসা ও বিদ্রোহের উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়বে অথবা আমানতদারী ও সততার উপর অবিচল থাকার পরিবর্তে পশ্চাৎপদ হতে থাকবে অথবা সত্য-ন্যায়ের সাহায্য করার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করবে এবং এই বাস্তব জগতে ফলপ্রসূ কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে বসে থাকবে।

ইবাদতের অর্থ কখনো তা হতে পারে না এবং আল্লাহ্র সাথে এই ধরনের লোকের কোন আন্তরিক সম্পর্ক নেই। বরং এই ব্যক্তি ইবাদতের রাস্তায় উদ্‌ভ্রান্ত পথিক, সে কখনো গন্তব্যস্থলের মুসাফির হতে পারে না। গন্তব্যস্থলের দিকে বিরামহীনভাবে অগ্রসর হওয়ার পথে সময়ে সময়ে পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য বিরতি দেয়ার নামই হচ্ছে মূলত ইবাদত। এর ফলে কলব উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে যা তাকে কর্মতৎপর রাখতে পারে এবং মানুষ আরো সামনে অগ্রসর হতে পারে।

ইসলামে একথা সুস্পষ্ট যে, পার্থিব জীবনের কাজকর্মই হচ্ছে ইবাদত যদি অন্তর আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۔

"তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোন নেকীর ব্যাপার নয়। বরং প্রকৃত নেকীর কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ, আখেরাতের দিন

ও ফেরেশতাদের এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীদেরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে; আর আল্লাহ্‌র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য ব্যয় করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে। প্রকৃত নেককার তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে এবং দারিদ্র্য, সংকীর্ণতা, বিপদের সময় ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী এবং এরাই মুত্তাকী" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)।

এই হচ্ছে ইসলামের নির্ধারিত ইবাদতের পাঠ্যতালিকা এবং এর উপরই ইসলাম মানুষের প্রশিক্ষণের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এর মৌলিক শর্ত হচ্ছে একনিষ্ঠ নিয়াত ও আল্লাহ্ ভীতি।

ইসলামের অর্থ হচ্ছে সমুন্নত থাকা

প্রথম যুগের মুসলমানগণ উত্তমরূপেই জানতেন, ইসলামের অর্থ হচ্ছে সমুন্নত হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تَهِنُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٠

"তোমরা মনমরা হয়ো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা ঈমানদার হও" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৩৯)।

উল্লিখিত আয়াতে বিজয়ী বা সমুন্নত হওয়াকে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার উপায়ও এমনভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে যে, ভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। আর তা হচ্ছে ঃ "যদি তোমরা ঈমানদার হও"। অর্থাৎ বিজয়ী ও উন্নত হওয়ার একমাত্র উপায় হবে ঈমান। এই উন্নতির উৎস কোন বস্তুগত শক্তি নয়, ধন-সম্পদও নয়, কোন জড়বাদী মতাদর্শও নয় অথবা কোন ভাষা, ভৌগোলিক বা বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদও নয়, অর্থাৎ প্রতিটি জাহিলী যুগের লোকেরা উন্নতি, প্রগতি ও প্রতিপত্তি হাসিলের জন্য যে উপায়- উপকরণ ব্যবহার করেছে। বরং ইসলামে অগ্রগতি ও প্রতিপত্তি হাসিলের একটিমাত্র উপায় রয়েছে, আর তা হবে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল ঈমান।

ইসলাম মুসলমানদের কেবল উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভের পরামর্শই দেয় না, বরং তাদেরকে সেই 'সত্য' অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়েও তোলে যার সামনে বাতিল স্থির থাকতে পারে না। একজন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক কর্মতৎপর থাকার কারণে জগত ও জীবনের রহস্য সম্পর্কেও অবহিত থাকে এবং সে সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হয়। কেননা যারা ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত তাদের তুলনায় তার দৃষ্টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। জগত ও জীবন সম্পর্কে একজন মুমিনের দৃষ্টিভংগী সাধারণ লোকদের তুলনায় অত্যন্ত গভীর ও তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে মানুষ ও মানবজীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগী এতোটা প্রশস্ত, ব্যাপক ও পূর্ণাংগ হয়ে থাকে যে, ঈমান থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি তার কল্পনাও করতে পারে না।

অতএব জীবন ও জগত সম্পর্কে মুমিন ব্যক্তির এই প্রশস্ত ও সামগ্রিক দৃষ্টিভংগীই তার এই বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস, যা বহির্বিশ্বে তাকে প্রতিপত্তি দান করে। কেননা এই প্রতিপত্তি যেমন আত্মার জগতে সৃষ্টি হয়, অনুরূপভাবে বহির্জগতেও তার প্রকাশ ঘটে।

প্রথম যুগের মুসলনমানগণ এই সত্য সম্পর্কে গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে অবহিত ছিলেন। এ কারণেই তাদের যে কোন ব্যক্তির হৃদয়ে গভীর ঈমান প্রবেশ করতেই তিনি নিজেকে এক নতুন জীবনের অধিকারী এবং জগতের বুকে প্রচলিত সব জাহিলিয়াতের তুলনায় উচ্চতর ভাবতে থাকেন।

আর আপাত দৃষ্টিতে যেমন মনে হয় এটা কেবলমাত্র সেজন্য ছিলো না, বরং তাওহীদের চেতনা মানুষের মনের কাছে প্রতীমা পূজার বিস্বাদ ও প্রাণহীনতা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। এ কারণে একজন তাওহীদবাদী নিজেকে অনেক উন্নত অনুভব করতে থাকে। যদিও এটা মূলত একটি সত্য, কিন্তু প্রতিপত্তি লাভ করার জন্য এটাই সামগ্রীক সত্য ছিলো না। কেননা মূর্তিপূজা কেবল একটি আকীদাই ছিলো না যে, মুমিন ব্যক্তি নিজের চিন্তা ও বিবেকের সাহায্যে তার মোকাবিলা করে উন্নত হয়ে যাবে, বরং এটা ছিলো একটি বস্তুগত ও মতবাদগত শক্তি যা মানুষ, ধন-সম্পদ ও অস্ত্র-সস্ত্রের আকারে বর্তমান ছিলো। এই শক্তি কাফেরদের কর্তৃত্বের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিলো। তা মুসলমানদের বিভিন্নরূপে কষ্ট দিতো এবং হেদায়াতের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে যেতো।

প্রথম যুগের মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও যেসব শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন তা ছিলো এই কুফরী শক্তি। অথচ তারা ছিলেন বস্তুগত শক্তি বঞ্চিত, কিন্তু তারা বাতিলের যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এজন্য বিজয়ী হতে পেরেছিলেন। এই প্রতিপত্তি কেবল চিন্তা-চেতনাগতই ছিলো না, বরং বহির্জগতে তার একটি বাস্তব অবস্থান ছিলো। যে বস্তুগত ও মতাদর্শগত শক্তি মুসলমানদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং যে কোন পন্থায় তাদের মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করতো, মুসলমানদের ঈমানী শক্তি সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করে।

অতঃপর মুসলমানদের যখন রোম ও ইরানের সাথে যুদ্ধ হয় তখন আর একবার মুসলমানগণ সেই জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলেন, যারা বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির দিক থেকে মুসলমানদের তুলনায় অনেক গুণ শক্তিশালী ছিলো। তারা যখন রোম ও ইরানের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন তখন তাদের উপর নিজেদের সংখ্যাশক্তির বলে বিজয়ী হননি। কেননা মুসলিম সৈনিকদের সংখ্যা শত্রু বাহিনীর তুলনায় নেহায়েতই কম ছিলো। বস্তুগত সম্পদের জোরেও মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হননি। কেননা তখন মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। অতি কষ্টেই তাদের দিন কাটতো। অস্ত্রের জোরেও তারা এ যুদ্ধে বিজয়ী হননি। কেননা শত্রুপক্ষ কেবল অস্ত্রের পরিমাণের দিক থেকেই মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলো না, বরং সামরিক সংগঠন ও শৃখংলা এবং যুদ্ধ বিদ্যায়ও তারা ছিলো অত্যন্ত পারদর্শী। অথচ আরবরা এ সম্পর্কে ছিলো সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবরা কেবল ছোটখাট লুণ্ঠন বা ছিনতাই করতো। মুসলমানরা আরবদের সাহায্যেও এই যুদ্ধে জয়লাভ করেনি। একথা সত্য যে, আরবরা সব সময় নিজেদের আরবীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে গৌরব করতো। কিন্তু এই আরববাদ তাদেরকে তৎকালীন রোম ও ইরানের মতো দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার মতো শক্তি যোগায়নি। পক্ষান্তরে কতিপয় আরব গোত্র এই শক্তিদ্বয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আরব বেদুইনদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। মুসলমানরা নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাহায্যেও এই বিজয় অর্জন করেননি।

কেননা তৎকালে রোম ও পারস্যের রাজতন্ত্র নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে আরব উপদ্বীপের পশু-পালকদের তুলনায় অনেক উচ্চ ও উন্নত ছিলো।

একটি জিনিসই মুসলমানদের এই বিজয় দান করে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপর অবিচল ঈমান। তারা নিজেদের অনুভূতির কারণে তাদের উপর বিজয়ী হয় যে, তারা মুমিন এবং সমস্ত সৃষ্টির তুলনায় উৎকৃষ্ট। তাদের প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য, সামরিক দক্ষতা, উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য, তাহযিব-তমদ্দুন, সাংগঠনিক শক্তি-শৃংখলা, আইন-কানুনগত শ্রেষ্ঠত্ব যতোই অধিক হোক না কেন, মুসলমানদের বিজয়ে তা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কেননা আল্লাহ্‌র দেয়া শরীআত কবুল করা ছাড়া এ সবই জাহিলিয়াত ও গোমরাহী।[৮]

ঈমানের বরকতে প্রতিপত্তি অর্জনকারী মুসলিম শক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলো। তারা জ্ঞানার্জন করলো। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করলো। সমস্ত প্রকারের হাতিয়ারের মাধ্যমে সুসজ্জিত হয়ে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পূর্ণতা অর্জন করে বাস্তব জগতের সামনে প্রমাণ করে দেখালেন যে, তারা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এতোটা দ্রুত গতিতে স্বল্প কালের মধ্যে তারা পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়লেন যার নজীর ইতিহাসে নেই। তারা বিজয়ীর বেশে সর্বত্র হেদায়াতের আলো ছড়িয়ে দিলেন এবং নিজেদের পথের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

মুসলমানরা যখনই যেখানে বিজয়ী হয়েছেন তার মূল কারণ এই ছিলো না যে, তাদের সংখ্যাশক্তি ছিলো প্রচুর অথবা তাদের কাছে ধন-সম্পদ ও সামরিক শক্তির প্রাচুর্য ছিলো অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তারা উন্নতির শীর্ষে পৌছে গিয়েছিলেন। তাদের প্রতিপত্তি ও বিজয়ের মূলে ছিলো কেবল তাদের ঈমান। তারা ছিলেন হকপন্থী এবং তাদের চারপাশের শক্তিগুলো ছিলো

---

৮. লেখক এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে, আরবরা তাদের প্রতিপক্ষের জাগতিক শক্তির দিক দিয়ে সর্বক্ষেত্রে ছিল পশ্চাৎপদ। কিন্তু আদের ঈমানী শক্তি ছিল প্রবল ও পূর্ণাঙ্গ, যা তাদের প্রতিপক্ষের ছিলো না। তবে জাগতিক শক্তিগুলোর সহায়তা ছাড়াই তারা নিছক ঈমানের জোরে ও রূহানী শক্তির বলে যুদ্ধে জয়লাভ করেনি। বরং তারা সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় মৌলিক জাগতিক শক্তি অর্জন করেছিল এবং তাকে ধীরে ধীরে উন্নত ও পরিপুষ্ট করেছিল আর এই সাথে ঈমানী শক্তি দিয়ে তার ফাঁকগুলো পূরণ করেছিলো (সম্পাদক)।

বাতিলপন্থী। এই বিজয়ের পর তাদের সংখ্যাশক্তিও বেড়ে গেলো, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও দেখা দিলো, সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি পেলো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উন্নতি হলো। ঈমানের বরকতে সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ প্রতিপত্তির কারণে তারা বহির্দুনিয়ায়ও বিজয়ী এবং যাবতীয় ধরনের শক্তি ও প্রাচুর্য লাভ করলেন।

মানুষ একটি প্রভাবশালী ও কর্মতৎপর শক্তি

এভাবে প্রথম যুগের মুসলমানরা ইসলামের অর্থের মধ্যে এ কথাও পেয়েছেন যে, মানবজাতি জমীনের বুকে একটি প্রতিপত্তিশালী ও কর্মক্ষম শক্তি। তারা যেমন কুরআন-হাদীসের আলোকে একথা বুঝতে পেরেছিলেন, তেমনি তাদের বাস্তব জীবনেও তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত অনুযায়ী জীবন যাপন করে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ·

"যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীর বুকে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে যাচ্ছি" (সূরা বাকারা ঃ ৩০)।

তারা এই আয়াতের তাৎপর্য এই বুঝেছেন যে, এই জগতের বুকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হওয়ার ভিত্তিতে শ্রমসাধনার মাধ্যমে এই জমীনকে আবাদ রাখা এবং জীবনের স্পন্দনকে গতিশীল রাখা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ·

"হে মানুষ ! তুমি তোমার রবের কাছে পৌছা পর্যন্ত কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। অতঃপর কিয়ামতের দিন তুমি এই কাজের প্রতিফলের সাথে গিয়ে মিলিত হবে" (সূরা ইনশিকাক ঃ ৬)।

প্রতিনিধিত্বের এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ এই জগতের প্রতিটি জিনিসকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন এবং তার অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ·

"তিনি জমীন ও আকাশমণ্ডলের সমস্ত জিনিসই তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, সবকিছুই তাঁর নিজের কাছ থেকে এসেছে" (সূরা জাসিয়া ঃ ১৩)।

কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, এই অধীন-নিয়ন্ত্রিত রিযিক শক্তিকে নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও শ্রমসাধনার মাধ্যমে অর্জন করে নেয়া।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ ·

"সেই আল্লাহ্-ই ভূ-পৃষ্ঠকে তোমাদের অধীন বানিয়ে রেখেছেন। তোমরা চলাচল করো এর বক্ষের উপর এবং ভক্ষণ করো আল্লাহ্র দেয়া রিযিক" (সূরা ঃ মুলক ঃ ১০)।

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ·

"আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ সেই জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলী পরিবর্তন না করে" (সূরা রাদ ঃ ১১)।

অনুরূপভাবে প্রথম যুগের মুসলমানগণ উপরোক্ত আয়াতের মর্ম এই বুঝেছিলেন যে, জীবনের ঘটনাবলী অংকের মতো দুয়ে দুয়ে চার যেমন তেমনি ঘটে যায় না। যদিও একথা সত্য যে, প্রতিটি ঘটনা আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই ঘটে থাকে এবং আসমান-যমীনে যা কিছু আছে তার জ্ঞান আল্লাহ্র কাছে আছে। অদৃশ্য জগতের চাবি তাঁরই হাতে। কিন্তু এটাও আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিলো যে, যে মানুষকে জমীনের বুকে খলীফা বানানো হয়েছে তাকে এমন যোগ্যতা দান করতে হবে যাতে তার ইচ্ছার মাধ্যমে জমীনের বুকে আল্লাহ্র ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে পারে। এভাবে মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম ইতিহাস সৃষ্টি করবে এবং ঘটনা-দুর্ঘটনার মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হবে। আল্লাহ্র বিধান এই যে, আল্লাহ্র স্বাধীন শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন জাতির অবস্থা তিনি নিজে পরিবর্তন করেন না এবং তাদের মধ্যে এমন কোন পরিবর্তন আনেন না যা তারা নিজেদের জন্য কামনা করে না।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ·

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে" (সূরা রূম ঃ ৪১)।

প্রথম যুগের মুসলমানগণ উপরোক্ত আয়াতের তাৎপর্য এই বুঝেছিলেন যে, বিপর্যয় অদৃশ্য জগতের কোন নির্ধারিত জিনিস নয়, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে

জমীনে নাযিল করা হয় এবং মানুষ তার কারণসমূহ অবহিত থাকে না। বরং মানুষের কৃতকর্মের দরুনই জমীনের বুকে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষই যেন পার্থিব জীবনের সেই প্রভাবশালী শক্তি যার কৃতকর্ম অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশ পায়। ভালো কাজ করলে ভালো ফল এবং খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল প্রকাশ পাবেই। আগেকার মুসলমানগণ মনে করতেন যে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের নিজেদেরই কাজ করতে হবে। যে দীনের উপর তারা ঈমান এনেছেন এবং যে দীনকে তারা কল্যাণের একমাত্র উৎস মনে করেন তা আপনা আপনি কায়েম হবে না। আর আপনা আপনি এর প্রচার-প্রসার হতেও পারে না। বরং এই দীন তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় এবং নিজেদের দীনের হেফাজত করার মাধ্যমেই কায়েম হতে পারে। যতোটা প্রচেষ্টা চালানো হবে এ দীন ততোটাই কায়েম হবে। অতঃপর তারা যদি দীনের কোন বড়ো অথবা ছোট ব্যাপারে দুর্বলতা বা অলসতা দেখান, তাহলে সেই পরিমাণে তাদের দীনের মধ্যেও দুর্বলতা এসে যাবে।

অতএব মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে, সব সময় সজাগ থাকা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে, মুসলিম সমাজ ও গোটা দুনিয়ার স্বার্থে তাদের সজাগ থাকতে হবে। অন্যথায় কোন সাফল্য, কোন শক্তি বা কোন প্রতিপত্তি ও বিজয় অর্জিত হতে পারে না। কেননা এসব কিছুই কেবল নির্ভেজাল ঈমানের বলেই হতে পারে। বরং ঈমানের তাৎপর্য হচ্ছে তাই এবং আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্যও তাই ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করো, সত্যের খেদমত করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা কৃতকার্য হতে পারবে” (সূরা আল ইমরান ঃ ২০০)।

Wilferd Cantwell Smith তাঁর Islam in Modern History গ্রন্থের ৩২ নম্বর পৃষ্ঠায় ইতিহাস সম্পর্কে হিন্দু, খৃস্টান, মুসলমান ও মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"একজন মুসলমান একজন মার্কসবাদীর মতোই হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অনুভব করে যে, এই দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে তার সুদূর প্রসারী প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এই প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। মজবুত ও সরল-সঠিক ভিত্তির উপর সমষ্টিগত জীবনের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। এ এক বাস্তব সত্য যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য যতো প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে অথবা হচ্ছে, তার মধ্যে ইসলামের প্রচেষ্টা সর্বাধিক। মার্কসবাদী ব্যবস্থা কায়েমের পূর্বে ইসলামের প্রচেষ্টা ছিলো এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সর্বাধিক, সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে মহান। কিন্তু মার্কসবাদী ও ইসলামী দৃষ্টিভংগীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইসলামে প্রতিটি পার্থিব ঘটনার দু'টি দিক রয়েছে এবং মুসলমানগণ প্রতিটি ব্যাপার এই দু'টি দিক থেকে দেখে থাকে। যেমন তারা মনে করে, মানুষের প্রতিটি কাজ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই যুগপৎভাবে সংঘটিত হয়। পার্থিব বিষয়ের মধ্যে যে জিনিসটি সমষ্টিগত কাজের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই কাজটি ঠিক একই সময় ব্যক্তিগত কাজের সমষ্টি হয়ে থাকে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমষ্টির সামগ্রিক কাজের মধ্য থেকে নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্যও জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কাজের কিছু সুনির্দিষ্ট ফলাফল এই পার্থিব জগতে প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং বাকিটা আখেরাতে প্রকাশ পাবে। অন্য কথায় বলা যায়, প্রতিটি কাজকে নিজস্বভাবে যাচাই করা যায়, যেমন তাকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাথে যাচাই করা যেতে পারে।

অধিবিদ্যার (Metaphysics) একজন শিক্ষক বলতে পারেন, এই পৃথিবী যেখানে আমরা বসবাস করছি, মানুষের এই দেহ যেসব উপাদানের সমষ্টি এবং এই জীবন যার সাহায্যে আমাদের অস্তিত্বের ইতিহাস গঠিত হয়েছে, এ সবই সত্যের সাথে নিকট সম্পর্কযুক্ত। কোন পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভংগীর সাহায্যেও পৃথিবীর বুকে বাস্তবিকভাবে প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধের চেয়ে উন্নততর মূল্যবোধের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের নিজস্ব নিদর্শন ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। তা কখনো নিজের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় না। বরং ইতিহাসের ঘটনাবলীর চেয়েও উন্নত কিছু মানদণ্ড রয়েছে। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে ইতিহাসের ঘটনাবলীর উপর সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব এবং অত্যাবশ্যকও। সুতরাং ইসলামী চিন্তাধারায় কার্যত এই মানদণ্ডের দাবি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়"।

প্রথম যুগের মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় ইসলামের তাৎপর্য এরূপই ছিলো। এই তাৎপর্যের মৌলনীতি ও আনুসংগিক বিষয়ের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে যায়। এর ফলে মুসলিম সমাজ পূর্বের ও পরের সমস্ত সমাজ-সমৃদ্ধির তুলনায় অধিক বিকশিত ও বৈশিষ্ট্য সমন্বিত প্রতীয়মান হয়। ইসলামী সমাজের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ও প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

এই সমাজের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। এই আনুগত্যের মধ্যে কোনরূপ দুর্বলতা বা সংশয়-সন্দেহের অবকাশ ছিলো না। অবশ্য আনুগত্যের মান অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পার্থক্য বিদ্যমান ছিলো। তাদের মধ্যে এমন মানবিক দুর্বলতাও ছিলো যা মানুষকে উন্নত স্তরে পৌছতে এবং সেখানে অবিচল থাকার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ কারণে সমাজের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। এই বৈশিষ্ট্য সমাজের ভেতরের লোকেরাও এবং একে বাইরে থেকে অবলোকনকারীরাও বর্ণনা করতো।

ইসলামই একমাত্র সমাজব্যবস্থা যা গোটা সমাজে আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকর করা এবং তাকে কেবল আল্লাহ্র শিক্ষার উপর কায়েম রাখার জন্য চেষ্টা করে। এ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইসলামী মেজাজের কারণে অনুভব করতো যে, তার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা সে কোনক্রমেই উপেক্ষা করতে পারে না। এমনকি যদি কখনো তার মধ্যে দুর্বলতা এসে যায় এবং দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে সে নিজেই এই দুর্বলতা স্বীকার করে নেয় এবং কখনো একথা বলে না যে, তার ফয়সালাই উত্তম অথবা তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের তুলনায় অধিক নির্ভুল। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করতো যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে বাধ্য এবং তাদের নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত রয়েছে। তার কর্তব্য হচ্ছে, সে মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করবে এবং ইসলামের শিক্ষার বাস্তবায়ন করবে। সে তার ব্যক্তিগত জীবনে কেবল ইসলামের মৌলিক নির্দেশেরই অনুগত নয়, বরং আনুসংগিক ব্যাপারেও সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বাধ্য। এমনকি উঠাবসা, চলাফেরা, আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদ,

চেহারা-সুরত এবং দাঁত পরিষ্কার করার ব্যাপারেও সে ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ করতে বাধ্য।

মুসলিম সমাজের প্রত্যেক নারী-পুরুষ অনুভব করতো যে, আল্লাহ্র নির্দেশকে ছোট-বড়ো, গুরুত্বপূর্ণ-অগুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় ও অপ্রোজনীয়, এভাবে ভাগ করা সম্ভব নয়, বরং গুরুত্বের দিক থেকে সবগুলোই সমান। তবে যেসব নির্দেশের ক্ষেত্রে আল্লাহ রুখসাত অথবা আযীমাতের (অনুমতি ও অবিচলতা) অবকাশ রেখেছেন সে ব্যাপারগুলো স্বতন্ত্র।

একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, সে সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহের আনুগত্যও করবে এবং সাথে সাথে সেগুলো সমাজে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করবে। এই আনুগত্য ও বাস্তবায়ন আল্লাহ্র উপর পরিপক্ক ঈমানের সাথে হতে হবে এবং এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, যতোক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পন্থায় খোদায়ী বিধান কার্যকর না করা হবে ততক্ষণ কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। এ প্রসংগে দাঁত মাজা ও যুদ্ধক্ষেত্রে জিহাদ করা উভয়ই সমান গুরুত্বের দাবিদার। এমনকি মুসলমানগণ এই ধরনের (প্রকাশ্যত সম্পর্কহীন) দু'টি বিষয়কে পরস্পরের সাথে এতোটা সংযুক্ত মনে করতো যে, তারা এক যুদ্ধে দাঁতন না করাকে বিজয় লাভে বিলম্ব হওয়ার কারণ মনে করে এবং আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় লাভের অধিকারী হওয়ার আশায় দাঁতন করার জরুরী নির্দেশ পালনের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেননা দাঁতন ও জিহাদ, উভয় নির্দেশের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। প্রত্যেক মুসলমান অনুভব করতো যে, ব্যক্তিগতভাবে তার উপর একটি কর্তব্য অর্পিত হয়েছে এবং সমষ্টিগতভাবে তার উপর আরেকটি কর্তব্য অর্পিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, যতোদূর সম্ভব তার চিন্তা-চেতনা ও বাস্তব কর্মধারা কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত ইসলামী পন্থা অনুযায়ী হতে হবে। সুতরাং সে মানুষকে ভালোবাসবে। কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা বা শত্রুতা পোষণ করবে না। গীবত করবে না। কাউকে অযথা দোষারোপ করবে না। কারো মান-ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। কাউকে কষ্ট দিবে না। কারো জানমালের ক্ষতি করবে না। প্রত্যেকের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা রাখবে, কল্যাণকর ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবে। প্রতিটি কাজে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের

দিকে লক্ষ্য রাখবে। কাউকে ধোঁকা দিবে না। কারো অধিকার ছিনিয়ে নিবে না। কারো সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। কোন নির্দেশ পালন করার যোগ্যতা থাকা অবস্থায় তা এড়িয়ে যাবে না। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ করবে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা, তাঁর রব হওয়ার উপর বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর আনুগত্য করা। এরই ভিত্তিতে তার উপর আরো অনেক দায়িত্ব অর্পিত হয়। অতএব অবশিষ্ট সব ইবাদত, আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে তা পূর্ণ করবে।

সমাজের পক্ষ থেকে তার উপর যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয় তা হচ্ছে, নিজের সমাজকে ইসলামের পবিত্র ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থির রাখার জন্য বাস্তব প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা। কেননা কোন লোকের ব্যক্তিগতভাবে একজন মুসলমানের চালচলন গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং পূর্ণাংগ ও সঠিক ইসলামের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে তার সমাজকেও পূর্ণরূপে ইসলামের চিত্র অনুযায়ী হতে হবে এবং এইজন্য যে কোন প্রকারের শ্রম-সাধনা, চেষ্টা-তদবীর ও কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন হয় তা কাঁধে তুলে নিবে।

প্রথম যুগের প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মহিলা অনুভব করতেন যে, এই কাজ করা তার ব্যক্তিগত কর্তব্যও এবং সমষ্টিগত কর্তব্যও। এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া বা তা পাশ কাটিয়ে যাওয়া অথবা দোটানা ভাব দেখানো বা অলসতা প্রদর্শন করা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। এ কারণে প্রথম যুগের মুসলিম সমাজ সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত নিষ্কলুষ ও আলোকদীপ্ত ছিলো। এ পবিত্রতা তাদের চরিত্র-নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমষ্টিগত সম্পর্ক এবং চিন্তাগত, আধ্যাত্মিক ও সামরিক কার্যকলাপ, মোটকথা জীবনের সার্বিক দিকে বিদ্যমান ছিলো।

তৎকালের মুসলমানগণ কখনো এই ধরনের চিন্তা করতেন না যে, তারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ্র বন্দেগী করার পর যে কোন কর্মধারা অবলম্বন করবেন অথবা কোন অমুসলিম সমাজের মতো নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে নিলে কোন বাঁধা নাই। তারা কখনো এটা কল্পনাও করতে পারতেন না যে, সমাজকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হতে দেখে এবং তা প্রতিরোধের চেষ্টা না করেও মুসলমান থাকা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে সেই যুগের কোন মহিলাও এটা চিন্তাও করতে পারতেন না যে, তিনি কেবল নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার পর নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা, পুরুষের সাথে সম্পর্ক এবং চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে যে ধরনের দৃষ্টিভংগীই গ্রহণ করুন অথবা যে অমুসলিম সমাজের মতোই নিজেকে ঢেলে সাজান তারপরও তিনি মুসলমান থাকতে পারেন। তারা এটাও কল্পনা করতেন না যে, সমাজ-পরিবেশের সংশোধন এবং তাকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা-সাধনা না করলেও মুসলমান থাকা যায়।

সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও নারী পূর্ণরূপে অনুধাবন করতেন যে, তাদের মুসলমান হওয়ার কারণে তাদের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সমাজের ছোট-বড়ো প্রতিটি ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং অনবরত অনুভব করতে থাকেন যে, তাদেরকে প্রতিটি ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির পালা আসার পূর্বে তাদের নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া একান্ত কর্তব্য। তাহলেই তারা মুসলামান থাকতে পারেন।

ইসলামের এই অর্থ ভালোভাবে হৃদয়ংগম করে নেয়ার ফল এই হয়েছিলো যে, সেই সময়কার ইসলামী সমাজ অনুভব করতো যে, তা আল্লাহর আনুগত্য এবং শরীআতের অনুবর্তন করার বদৌলতেই পৃথিবীর বুকে একমাত্র পরাশক্তি হতে পেরেছে। এটা এমন এক বিজয়ী শক্তি যাকে মানবতার কর্মকাণ্ডের লাগাম নিজের হাতে নিয়ে তাকে সহজ-সরল পথে চালাতে হবে। তাদের এই অনুভূতির মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য পথভ্রষ্ট কাফের জনতার সাথে বস্তুগত অথবা নৈতিক শক্তির তারতম্য অথবা সমকক্ষ বা ক্ষুদ্রতর হওয়ার ধারণা কখনো অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। কেননা মুসলমানগণ যদি জনশক্তি, সমরাস্ত্রের প্রাচুর্য, প্রযুক্তি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব অথবা সাংগঠনিক যোগ্যতার দিক থেকে নিজেদেরকে কাফেরদের সাথে তুলনা করতেন তাহলে তারা যুদ্ধে যাবার পূর্বেই পশ্চাদপদ হতেন, বরং কখনো সামনে অগ্রসর হওয়ার কল্পনাও করতেন না এবং মনের মধ্যে নিজেদের পরাজিত, দুর্বল, নীচ, অপমানিত ও ঘৃণিত অনুভব করে জিহাদের খেয়াল থেকে নিবৃত্ত থাকতেন।

তাদের ধারণায় এটাই সত্য ছিলো। আর এই সত্য থেকে যাবতীয় সত্য বেরিয়ে আসে। সেই সত্য এই যে, তারা ঈমানদার। তারা আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের অনুগত। অতএত তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোন্নত। তাদের ছাড়া দুনিয়ার আর যাবতীয় শক্তি তুচ্ছ ও হীন, তা গণনায় ধরার মতো নয়। অতঃপর এটা একটা বাস্তব সত্যের আকারে সামনে এলো। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হওয়ার কারণে জগতের বুকে এমন এক প্রভাবশালী শক্তি হয়ে যে কোন দিক থেকে বিজয়ী প্রমাণিত হন যে, সেই শক্তি গোটা মানবজাতির লাগাম হাতে নিয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এই অনুভূতির ফল কেবল সামরিক বিজয়ই ছিলো না। যদিও মুসলমানদের সামরিক সাফল্য মানব ইতিহাসের বিস্ময়কর অবদান, কিন্তু মূলত ইসলাম এমন একটি আন্দোলন প্রমাণিত হয়, যা মানব জীবনের প্রতিটি দিকে জীবনীশক্তির পয়গাম নিয়ে প্রবেশ করে।

অতএব যে সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, ইসলাম খুব দ্রুত গতিতে তাকে নিজের স্বতন্ত্র মেজাজ-প্রকৃতি অনুযায়ী এমনভাবে ঢেলে সাজাতে থাকে যে, ঐ সভ্যতার যা গ্রহণযোগ্য তা হুবহু গ্রহণ করে, যা গ্রহণের অযোগ্য তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এবং কতগুলোকে নিজের বিশেষ দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন সাধন করে তার মধ্যে ইসলামী প্রাণসত্তা ফুঁকে দেয়। ফলে সেই সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ইসলামী সভ্যতা- সংস্কৃতি ও ইসলামী ব্যবস্থায় পরিণত হয়। যুদ্ধ জয়ের সাথে সাথে এই সভ্যতা-সংস্কৃতিও বিজিত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ মুসলমানগণ বিজিত এলাকায় যে জ্ঞানভাণ্ডার পেয়ে যান তাতে সঠিক ও নির্ভুলভাবে অংশগ্রহণ করে তার উপর গবেষণা ও অনুসন্ধান চালান, তার মধ্যে সমৃদ্ধি আনয়ন করেন, অতঃপর তাকে ইসলামের রং-এ রঞ্জিত করে এবং ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার নাম দিয়ে নিজের সাথে বিজিত এলাকায় ছড়িয়ে দেন। এ জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শুধু মুসলমানরাই উপকৃত হয়নি, বরং জগতের প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসু এর সাহায্যে নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে।

প্রফেসর Gibb তাঁর Mo dern Trends in Islam গ্রন্থে লিখেছেন, "আমার বিশ্বাস, একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মুসলমানদের গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। মুসলমানদের এই অধ্যয়নের বদৌলতে মধ্যযুগে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের নীতিমালা ইউরোপ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো"।

ব্রেফোল্ট তার Making of Humanity গ্রন্থে লিখেছেন, "আরব সভ্যতা নতুন পৃথিবীকে (ইউরোপ) যা কিছু দান করেছে তার মধ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান। কেবল বিজ্ঞানই একমাত্র জিনিস নয়, যেজন্য ইউরোপ নতুন জীবন লাভ করে, ইসলামী সভ্যতার আরো অনেক কার্যকর জিনিস ছিলো যার আলোকরশ্মি গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত ইউরোপের উন্নতির কোন দিকও এমন নেই যা ইসলামী সংস্কৃতির ফল নয়। যে শক্তি বর্তমান দুনিয়াকে স্বতন্ত্র ও বলিষ্ঠ শক্তি দান করেছে এবং যা তার উত্থানের আসল উৎস অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অনুসন্ধান, তার লালন-পালন ও পরিবৃদ্ধির মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান"।

এসব কিছু ছাড়াও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়নকারী এবং তাঁর নির্দেশের অনুসারী এই মুসলিম সমাজ মানবজাতিকে এমন রীতিনীতি, কায়দা-কানুন এবং মূল্যবোধ ও মূলনীতি দান করেছে যা আজো, যখন ইসলামী দুনিয়ার পতন ঘটেছে এবং মানবতার পথপ্রদর্শন থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে, মানবতার ভিত্তিমূলের অনেক গভীরে প্রবেশ করে আছে। এই সত্যকে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী লেখকগণও অকপটে স্বীকার করেন।

২

ইসলামী সমাজের কতিপয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলে এসেছি, ইসলামের ব্যাপক ও প্রশস্ত অর্থের ধারণা কখনো পূর্ণাংগ হতে পারে না, যতক্ষণ আমরা তার বাস্তব রূপ মুসলিম সমাজে দেখতে না পাবো। প্রথম যুগের মুসলমানগণ তাদের জীবন ও সমাজকে ইসলামের এই দৃষ্টিভংগীর উপর গড়ে তুলেছিলেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামকে প্রয়োগ করে তার অর্থকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছিলেন।

এটা একটা সাধারণ ব্যাপার যে, যখনই ইসলামী সমাজের নমুনা পেশ করা হবে, তার উৎস হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন এবং সেইসব কর্মময় জীবন যাঁরা বিশ্ব-ইতিহাসের অমর ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন তো যে কোন দিক থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং পথপ্রদর্শক। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মুসলমানদের সামনে উদ্ভাসিত। তাঁর এই পূর্ণাংগ জীবন তাদের জন্য একটি নিখুঁত, পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী নমুনা হিসাবে কাজ করবে।

মুসলমানগণ তাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকে এবং তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত লাভ করে, তাঁর আনুগত্য এবং জীবনের প্রতিটি বিপদে ও কঠিন মুহূর্তে তাঁর উত্তম আদর্শ থেকে হেদায়াত লাভের সাধ্যমত চেষ্টা করে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা) ছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম নমুনা। এ এক বাস্তব সত্য যে, তাঁরা ছিলেন মানব ইতিহাসের বিরল ব্যক্তিত্ব। তদুপরি তাঁরা ছিলেন মানুষ। কিন্তু এমন মানুষ ছিলেন যাঁদের আত্মা আদিগন্ত বিস্তৃত নূর থেকে আলো সংগ্রহ করে অতি উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। তাঁরা মানব সত্তার জন্য এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন, যেখান থেকে মানুষ প্রতিটি অবস্থায় ও প্রতিটি যুগে দিকনির্দেশনা লাভ করছে। মুসলমানগণ তাদের কার্যাবলী, চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণার অনুসরণ করার জন্য প্রতিটি যুগেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তারা এই নমুনা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইসলামী সমাজের যে নক্শা চিরস্থায়ীভাবে অংকিত হয়ে আছে, তা যদি আমরা আবার পৃথিবীর বুকে কায়েম করতে চাই তাহলে স্বভাবতই এর কাঠামো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর মহান সাহাবীদের জীবন-চরিত থেকে গ্রহণ করতে হবে। আমরা এ পুস্তকে যে ইসলামের কথা আলোচনা করবো তা অবশ্যই সবার অনুসরণযোগ্য ইসলাম। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে যে ইসলাম আশা করা হয়েছে, যে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা এই যে, তদনুযায়ী প্রত্যেক লোক নিজেকে গড়ে তুলতে পারে, যেখানে মানুষের যোগ্যতা ও শক্তির পার্থক্যের দিকে নজর রাখা হয়েছে এবং যেখানে মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যে দুর্বলতা তাকে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেয় অথবা সে যদি এই বাধা অতিক্রম করে উন্নতির উচ্চ স্তরে পৌছতে পারে তাহলে এই দুর্বলতা তাকে সেখানে টিকে থাকতে দিতে চায় না।

অতএব আমরা এই পুস্তকে কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র জিন্দেগীর নমুনা পেশ করেই ক্ষান্ত হবো না, যদিও তাঁর পবিত্র সত্তা প্রতিটি যুগের ও প্রতিটি জেনারেশনের জন্য পথপ্রদর্শক। আবার সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর জীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করেও থেমে যাবো না, যদিও তাদের জীবন ইসলামের সর্বোচ্চ নমুনা। আবার বিভিন্ন যুগের ইতিহাস বিখ্যাত মনীষীদের অবদান উল্লেখ করেই আমরা তুষ্ট থাকবো না, বরং আমরা এইসব অনুসরণীয় নমুনার সাথে সাথে ইসলামী সমাজের মধ্যকার মানবীয় দুর্বলতার নমুনাও পেশ করবো। অর্থাৎ সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির কথাও আমরা বর্ণনা করবো যেখানে তাঁরা নিজেদের বাঞ্ছিত উন্নতি ও মর্যাদার উপর অবিচল থাকতে পারেননি। তাহলে একদিকে ইসলামী সমাজের সঠিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ধরন-প্রকৃতির আসল রূপ সামনে এসে যাবে এবং অন্যদিকে লোকেরা জানতে পারবে যে, ইসলাম মানুষের মন-মানসিকতা ও বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষের উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপায় না এবং মানুষকে এমন মানেও উন্নীত হতে চাপ দেয় না যেখান থেকে পদস্খলনের সম্ভাবনা নেই। সে মানুষের কাছে এটাও দাবি করে না যে, মুসলমান হওয়ার জন্য তাকে যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে হবে। বরং ইসলাম তার মানবীয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার সাথে ব্যবহার করে। সে তার কাছে এমন কিছু দাবি করে যা

পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব। তৃতীয়ত, লোকেরা জানতে পারবে যে, পার্থিব আকর্ষণের শিকার হয়ে দুর্বল মুহূর্তে মানুষের যে পদস্খলন ঘটে যায়, ইসলাম এটাকে কোন্ দৃষ্টিতে বিচার করে এবং কিভাবে এর প্রতিকার করে। তাহলে মানবাত্মা নতুনভাবে উন্নতি লাভ করে বাঞ্ছিত মানে এবং সেখান থেকে পছন্দনীয় মানে পৌছতে সক্ষম হবে। এখন আমরা কোন প্রকার নির্দিষ্ট বিন্যাস ছাড়াই ইসলামী সমাজের কতিপয় নমুনা উল্লেখ করবো।

একদিন এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে সেটা দান করার পর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছি ? সে বললো, না, আপনি ভালো ব্যবহার করেননি। এ কথায় সাহাবীগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তার দিকে ধাবিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইশারায় বলেন, থামো। অতঃপর তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বেদুইনের জন্য আরো কিছু পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছি? সে বললো, হাঁ। আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার পরিবারের লোকদেরকে এর উত্তম প্রতিফল দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এমন কিছু কথা বলেছিলে যার ফলে আমার সাথীদের ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিলো। অতএব তুমি যদি ভালো মনে করো তাহলে এখন যে কথা বললে তা তাদের সামনে পুনর্ব্যক্ত করো। তাহলে তাদের ক্ষোভ কেটে যাবে। বেদুইন বললো, আচ্ছা।

পরদিন বেদুইন আবার এলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন, এই বেদুইন গতকাল কিছু একটা বলেছিলো, যার ফলে আমি তাকে আরো কিছু দান করি এবং তাতে সে খুশি হয়। তিনি বেদুইনকে লক্ষ্য করে বললেন, তাই নয়? সে বললো, হাঁ। আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার পরিবারের লোকদের উত্তম প্রতিফল দান করুন। অতঃপর তিনি বললেন, এই বেদুইন এবং আমার তুলনা হচ্ছে এমন ব্যক্তির সাথে, যার উষ্ট্রী দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং লোকেরা তার পিছু ধাওয়া করছে। ফলে তা আরো দ্রুত গতিতে পলায়ন করছে। সুতরাং উষ্ট্রীর মালিক লোকদের ডেকে বললো, তোমরা আমাকে এবং আমার উষ্ট্রীকে একাকী ছেড়ে দাও। আমি এর কাছে বেশী পরিচিত এবং এর মেজাজ সম্পর্কে অধিক অবহিত। অতএব উষ্ট্রীর মালিক শুকনা ঘাস হাতে

নিয়ে সামনের দিক থেকে উষ্ট্রীর কাছে এলো এবং ধীরে ধীরে তাকে কাবু করতে থাকলো। অতঃপর সে খুঁটার উপর বসে গেলো। অনুরূপভাবে এই বেদুইনের কথার প্রেক্ষিতে আমি যদি তোমাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশে বাধা না দিতাম তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলতে এবং সে জাহান্নামে চলে যেতো।

কাব ইবনে মালেক (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। কাব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ তাঁর পরিচালক ছিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, তাবূকের জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে না গিয়ে পিছনে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে কাব ইব্‌নে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য আমি শুনেছি। কাব (রা) বলেছেন, তাবুকের জিহাদ ছাড়া আমি কোনো জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আলাদা ছিলাম না। তবে বদরের জিহাদ থেকেও আমি দূরে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই জিহাদে যারা শরীক হননি তাদের কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমগণ কোরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার ধন-সম্পদ দখলে নেওয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা (বাহ্যত) অসময়ে মুসলিমদেরকে তাদের দুশমনের সাথে সংঘর্ষের সম্মুখীন করে দিলেন। আমরা আকাবার রাতে যখন ইসলামের উপর কায়েম থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। যদিও বদরের জিহাদ মানুষের মধ্যে বেশী স্মরণীয়, তবুও আমি আকাবায় উপস্থিতির বদলে বদরের উপস্থিতিকে গ্রহণ করা পছন্দ করি না।

তাবূকের জিহাদে আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে না যাওয়ার ব্যাপার এই যে, এই জিহাদের সময় আমি যতোটা শক্তিশালী ও ধনবান ছিলাম এতোটা আর কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহ্‌র শপথ! এ জিহাদের সময় আমার দু'টি উট ছিলো। কিন্তু এর পূর্বে আমার দু'টি উট ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক গরমের ঋতুতে তাবূকের জিহাদে যান। সফর ছিলো অনেক দূরের। অঞ্চল ছিলো খাদ্য ও পানিহীন। আর শত্রুসৈন্যের সংখ্যাও ছিলো বেশী। তাই তিনি মুসলমানদের কাছে এই জিহাদের কথা খুলে বলে দিলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য ঠিকমত প্রস্তুত হতে পারে। তিনি তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে দিলেন। বহু মুসলিম মুজাহিদ এ জিহাদে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। সে সময় তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য কোন রেজিস্ট্রি বই ছিলো না। কাব (রা) বলেন, যে কোন লোক জিহাদে যোগদান না করে আত্মগোপন করতে চাইলে সে অবশ্যই মনে করতো যে, যতোক্ষণ তার সম্পর্কে ওহী নাযিল না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার ভূমিকা গোপন থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদে যান তখন গাছের ফল পেকে গিয়েছিলো এবং গাছপালার ছায়াও আরামদায়ক হয়ে উঠেছিলো। আমি এসবের দিকে আকৃষ্ট ছিলাম।

যাহোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে মুসলিমগণ প্রস্তুতি শুরু করলেন। আমিও তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করার উদ্দেশ্যে সকাল বেলা যেতাম বটে, কিন্তু কোন কিছু না করেই ফিরে আসতাম। আর মনে মনে ভাবতাম যে, আমি ইচ্ছা করলেই প্রস্তুতি নিয়ে ফেলতে পারবো। এভাবে গড়িমসি করতে করতে অনেক দিন চলে গেলো, এমনকি লোকেরা সফরের জোর প্রস্তুতি করে ফেললো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম মুজাহিদদের নিয়ে রওনা হলেন। কিন্তু আমি তো কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। আমি আবার প্রস্তুতি নিতে গেলাম কিন্তু কিছুই করলাম না। কিছুকাল আমার এই গড়িমসি চলতে লাগলো। এদিকে মুজাহিদগণ দ্রুত অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন এবং জিহাদও সন্নিকটে। আমি তখন মনে করলাম যে, রওয়ানা হয়ে গিয়ে ওদের সাথে মিলিত হবো। আহা! আমি যদি তা করতাম। তারপর আর তো আমার ভাগ্যেই হলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতাম, তখন যাদেরকে মোনাফিক বলা হতো এবং যাদেরকে আল্লাহ অক্ষম ও দুর্বল বলে গণ্য করেছিলেন সেই রকমের লোক ছাড়া আর কাউকে আমার মতো ভূমিকায় দেখতে পেতাম না। এ অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিতো।

তাবূক পৌঁছা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা স্মরণ করেননি। তাবূকে তিনি লোকজনের মধ্যে বসা অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, কাব ইবনে মালেক কি করলো ? বনি সালেমার এক লোক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তাকে তার চাদর ও শরীরের দুই পার্শ্বদেশ দর্শন আটকে রেখেছে (অর্থাৎ সে পোশাক-পরিচ্ছদ, শরীর গঠন ও সৌন্দর্যে লিপ্ত থাকায় জিহাদে আসেনি)। মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, তুমি যা বললে

তা খারাপ কথা। আল্লাহ্‌র শপথ! ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা তো তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এমন অবস্থায় তিনি সাদা পোশাক পরিহিত এক লোককে মরুভূমির মরীচিকা ভেদ করে আসতে দেখে বললেন, 'তুমি আবু খায়সামা? দেখা গেলো তিনি সত্যিই আবু খায়সামা আনসারী (রা)। আর আবু খায়সামা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি মোনাফিকরা যাঁকে টিট্‌কারি দিয়েছিলো এক সা' খেজুর সদাকা হিসেবে দান করেছিলেন বলে।

কাব (রা) বলেন, যখন তাবূক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিরে আসার খবর পেলাম তখন আমার খুব দুশ্চিন্তা হলো। তাই মিথ্যা ওজর ভাবতে লাগলাম। (মনে মনে) বলতে লাগলাম, কিভাবে তাঁর অসন্তোষ থেকে বাঁচতে পারি। আমার পরিবারবর্গের বুদ্ধিমান লোকদের সাহায্য চাইলাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসেছেন বলে খবর পাওয়া গেলো, তখন আমার মিথ্যা বলার ইচ্ছা দূর হয়ে গেলো, এমনকি কোন কিছু দ্বারা মুক্তি পাবো না বলে বুঝতে পারলাম। তাই সত্য কথা বলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন। আর তিনি সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাক্‌আত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকজনের কাছে বসতেন। এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি যখন বসলেন, তখন যারা এ জিহাদে যোগদান করেনি, তারা শপথ করে ওজর পেশ করতে লাগলো। এরূপ লোক আশিজনের বেশী ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রকাশ্য বক্তব্য গ্রহণ করলেন। তাদের বাইআত গ্রহণ করলেন এবং তাদের গুনাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের গোপন অবস্থা আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করলেন।

অবশেষে আমি হাযির হয়ে যখন সালাম দিলাম, তিনি রাগের হাসি হাসলেন, তারপর কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিজন্য পিছনে রয়ে গেলে? তুমি তোমার বাহন কিনেছিলে না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার লোকের কাছে বসতাম, তাহলে কোন ওজর দ্বারা তার অসন্তোষ থেকে বাঁচবার পথ দেখতে পেতাম। যুক্তি প্রদর্শনের যোগ্যতা আমার আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি, যদি আজ আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলি,

তাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু আল্লাহ্ আপনাকে আমার প্রতি অতি শীঘ্রই অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর সত্য কথা বলায় আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও আমি আল্লাহ্‌র নিকট শুভ পরিণতির আশা রাখি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার কোন ওজর ছিলো না। আল্লাহ্‌র শপথ! এ জিহাদে আপনার সাথে না গিয়ে পিছনে রয়ে যাওয়ার সময় আমি যতোটা শক্তিমান ও অর্থশালী ছিলাম অতোটা অন্য কোন সময় ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে সত্য কথাই বলেছে। আচ্ছা, উঠে যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ কোন ফয়সালা দান করা পর্যন্ত দেখা যাক।

বনী সালেমার কয়েকজন লোক আমার পিছনে পিছনে এসে আমাকে বলতে লাগলো, আল্লাহ্‌র শপথ! ইতিপূর্বে তুমি কোন অপরাধ করেছো বলে আমি জানি না। অন্য লোকদের মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনা তো তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো। এরা আমাকে এতোই তিরস্কার করতে লাগলো যে, আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার ইচ্ছা হলো। তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মতো এরূপ ব্যাপার আর কারো ঘটেছে কি? তারা বললো, হাঁ, আরো দু'জনের ব্যাপারও তোমার মতোই ঘটেছে। তুমি যা বলেছো, তারাও সেই রকমই বলেছে। আর তোমাকে যা বলা হয়েছে তাদেরকেও তাই বলা হয়েছে। কাব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই দু'জন কে কে?' লোকেরা বললো, তারা হচ্ছেন মুরারা ইব্‌নে রবীআ আল-আমেরী ও হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া আল-ওয়াকেফী (রা)।

কাব (রা) বললেন, লোকেরা আমাকে যে দু'জন লোকের নাম বললো, তারা ছিলেন খুবই সৎ ও আদর্শ পুরুষ এবং বদরের জিহাদে তারা যোগদান করেছিলেন।' কাব (রা) বলেন, লোকেরা ঐ দু'জনের খবর দিলে আমি আমার পূর্বেকার নীতির উপর অবিচল রইলাম।

যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিলো তাদের মধ্য থেকে আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিলেন। কাজেই সব লোক আমাদের নিকট থেকে দূরে থাকতে লাগলো (অথবা তারা আমাদের জন্য পরিবর্তিত হয়ে গেলো)। এমনকি আমার জন্য দুনিয়া একেবারে অপরিচিত হয়ে গেলো। এভাবে আমরা পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত থাকলাম। আমার দু'জন সাথী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং তাঁরা ঘরে বসে কাঁদতে থাকলেন (কারণ

তারা ছিলেন বয়োবৃদ্ধ)। আমি ছিলাম নওজোয়ান ও শক্তিশালী। তাই আমি বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে নামায পড়তাম এবং বাজারে চলাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্থানে বসলে তাঁকে সালাম দিতাম এবং মনে মনে ভাবতাম, দেখি তিনি সালামের জওয়াব দিতে ঠোঁট নাড়েন কিনা। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়তাম এবং চুপে চুপে দেখতাম তিনি আমার দিকে তাকান কিনা। আমি যখন নামাযে মশগুল হতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন। আবার আমি যখন তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে যখন মুসলিম সমাজের অসহযোগিতার দরুন আমার এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হলো, তখন আমি (একদিন) আবু কাতাদা (রা)-র বাগানের দেওয়াল টপকে তাকে সালাম দিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! সে আমার সালামের জওয়াব দিলো না। অথচ সে ছিলো আমার চাচাতো ভাই ও প্রিয়তম বন্ধু। আমি তাকে বললাম, আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি? সে চুপ রইলো। আমি আবার তাকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে এবারও চুপ থাকলো। আমি আবার শপথ দিলে সে বললো, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।" এ কথায় আমার দু'চোখ ফেটে পানি বের হয়ে এলো। আমি দেওয়াল পার হয়ে ফিরে এলাম। এরপর আমি একদিন মদীনার বাজারে ঘোরাফেরা করছিলাম, এমন সময় মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করার জন্য আগত এক সিরিয়াবাসী কৃষক আমাকে খুঁজতে লাগলো। লোকেরা তাকে আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগলো। সে আমার কাছে এসে আমাকে গাস্‌সান বাদশাহের একটি চিঠি দিলো। আমি চিঠিটি পড়লাম। তাতে লেখা ছিলো, 'আমরা জানতে পারলাম, তোমার সাথী রাসূলুল্লাহ (স) তোমার প্রতি জুলুম করেছে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার স্থানে থাকবার জন্য সৃষ্টি করেননি। তুমি আমাদের সাথে মিলে যাও, আমরা তোমাকে সাহায্য করবো।" পত্রটি পড়ে আমি বললাম, এটাও আমার জন্য পরীক্ষা। আমি তা চুলোয় পুড়িয়ে ফেললাম।

এভাবে পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন চলে গেলো এবং কোন ওহীও নাযিল হলো না। হঠাৎ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সংবাদদাতা আমাকে এসে জানালো, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে আমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দিবো অথবা অন্য কিছু

করবো? সংবাদদাতা বললো, না তুমি তার থেকে পৃথক থাকবে, তার নিকটে থাকবে না (অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে মিলন করবে না)। আমার অন্য দু'জন সাথীকেও অনুরূপ খবর দেয়া হয়েছে। আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলে যাও এবং আল্লাহ যতোক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা দান না করেন ততোক্ষণ তুমি তাদের কাছে থাকো। হেলাল ইব্‌নে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া খুবই বুড়ো মানুষ, তার কোন খাদেম নেই। আমি তাঁর খেদমত করলে আপনি কি অপছন্দ করবেন? তিনি বললেন, না, তবে সে যেন তোমার সাথে সহবাস না করে। হেলালের স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এই ব্যাপারে তার কোন শক্তি নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! এই দিন পর্যন্ত তার ব্যাপারে যা কিছু হচ্ছে তাতে সে সর্বদা কাঁদছে।

(কাব বলেন) আমার পরিবারের কেউ আমাকে বললো, 'তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তোমার স্ত্রীর (খেদমত নেয়ার) ব্যাপারে অনুমতি নিতে পারতে। তিনি তো হেলাল ইব্‌নে উমাইয়ার খেদমত করার জন্য তার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইবো না। না জানি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি কি বলেন। আর আমি হচ্ছি নওজোয়ান।

এভাবে (আরও) দশ দিন কাটালাম। আমাদের সাথে কথা বলা নিষেধ ঘোষণার পর থেকে পঞ্চাশ দিন গত হলো। তারপর আমি আমার এক ঘরের ছাদে পঞ্চাশতম দিনের ভোরে ফজরের নামায আদায় করে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম, যে অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ কুরআনে আমাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমার মন ছোট হয়ে গেছে এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

আমি এ অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় সাল্‌আ পাহাড়ের উপর থেকে একজন লোককে (আবু বাক্‌র সিদ্দীক) চীৎকার করতে শুনলাম। তিনি উচ্চস্বরে বলছিলেন, 'হে কাব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমি একথা শুনে সিজ্‌দায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, মুক্তি এসেছে। আল্লাহ যে আমাদের তওবা কবুল করেছেন, এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযান্তে সমস্ত লোককে জানিয়ে দিলেন। এতে লোকেরা আমাদের

সুখবর দিতে এলো। কতক লোক আমার দু'জন সাথীকে সুখবর দিতে গেলো। আর একজন লোক (যুবাইর ইবনুল আওয়াম) আমার দিকে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এলো। আসলাম গোত্রের একজন (হামযা ইবনে উমার আল-আসলামী) দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর উঠলো। ঘোড়ার চেয়ে আওয়াজ ছিলো দ্রুতগামী। সে আমাকে সুখবর দিচ্ছিলো। তার আওয়াজ আমি যখন শুনতে পেলাম, তখন আমি তার সুখবর দেয়ার জন্য (আনন্দের আতিশয্যে) নিজের কাপড় দু'খানা খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! সেদিন ঐ দু'খানা কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় আমার ছিলো না।

আমি অপর দু'খানা কাপড় ধার করে নিলাম এবং তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমার সাথে দেখা করে আমার তওবা কবুলের জন্য আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে লাগলো। তারা আমাকে বলতে লাগলো, আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করায় তোমার প্রতি অভিনন্দন। অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন, আর লোকেরা তাঁর চারপাশে বসা ছিলো। তাল্‌হা ইব্‌নে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুতবেগে উঠে এসে সাদরে আমার সাথে মোসাফাহা করে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আল্লাহ্‌র শপথ ! তাল্‌হা ছাড়া আর কোন মুহাজির উঠেননি। (বর্ণনাকারী বলেন) এজন্য কাব (রা) তাল্‌হা (রা)-র এই ব্যবহার ভুলেননি।

কাব (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দে জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছিলো। তিনি বললেন ঃ "তোমার জন্মদিন থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সবচেয়ে উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ করো"। আমি বললাম, এ খবর কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দিত হতেন, তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেতো এবং মনে হতো যেন এক টুকরা চাঁদ। আমরা তা বুঝতে পারতাম।

আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম, তখন বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ায় আমার মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সদকা করে দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কতক মাল রেখে দাও, সেটাই তোমার পক্ষে ভালো। আমি বললাম, আচ্ছা! তাহলে আমার

খায়বারের অংশটা রেখে দিলাম। আমি আরও বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ আমাকে সত্য কথা বলার জন্য মুক্তি দিয়েছেন। কাজেই আমার তওবার এটাও দাবি যে, আমি বাকী জীবনে সত্য কথাই বলে যাবো। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি যখন এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলছিলাম তখন থেকে সত্যের ব্যাপারে আল্লাহ অন্য কোন মুসলিমকে আমার মতো এমন উত্তম পরীক্ষা করেছেন বলে আমি জানি না। আল্লাহ্‌র শপথ ! ঐ সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন মিথ্যা বলার ইচ্ছা করিনি। বাকী জীবনেও আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন বলে আমি আশা রাখি। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তওবা কবুল করেছেন ... ...তিনি তাঁদের প্রতি মেহেরবান ও সদয়। আর সেই তিনজনের তওবাও কবুল করেছেন যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিলো। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো ....। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো" (সূরা তওবা ঃ ১১৭-১১৯)।

কাব (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যখন থেকে আল্লাহ আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন তখন থেকে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সত্য কথা বলাই আমার জন্য আল্লাহ্‌র বড়ো নেয়ামত। আমি যেন মিথ্যা বলে ধ্বংস না হই, যেমন করে মিথ্যাবাদীরা মিথ্যা বলে ধ্বংস হয়েছে। ওহী নাযিল হওয়ার যুগে আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের সবচেয়ে বেশী নিন্দা করেছেন। সূরা তওবায় আল্লাহ বলেন, "তোমরা যখন তাদের নিকট ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র শপথ করে ওজর পেশ করবে, যাতে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করো। যাক, তাদেরকে ছেড়ে দাও। তারা অপবিত্র, আর তাদের স্থান হবে দোযখ। এটা হচ্ছে তাদের কৃতকর্মের ফল। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট শপথ করে মিথ্যা ওজর পেশ করবে। তোমরা তাতে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ কিছুতেই এরূপ ফাসেক লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না" (সূরা তওবা ঃ ৯৫-৯৬)।

কাব (রা) বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ করে মিথ্যা ওজর পেশ করেছিলো তিনি তাদের ওজর কবুল করে তাদের বাইআত নিয়েছিলেন এবং তাদের গুনাহ মাফের দোয়াও করেছিলেন। আর

আমাদের তিনজনের ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দিলেন। আল্লাহ যে বলেছেন ঃ "আর যে তিনজন পিছনে রয়ে গিয়েছিলো" তার অর্থ জিহাদ থেকে আমাদের পিছনে থাকা নয়, বরং তার অর্থ এই যে, আমাদের ব্যাপারটা ঐসব লোকের পরে রাখা হয়েছিলো যারা মিথ্যা ওজর পেশ করেছিলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কবুল করেছিলেন (সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)।

অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পসন্দ করতেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ তিনি দিনের বেলা দুপুরের পূর্বে ছাড়া সফর থেকে ফিরতেন না। আর সফর থেকে ফিরেই তিনি প্রথমে মসজিদে যেতেন। তারপর সেখানে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। তারপর বসতেন।

ইমরান ইব্‌নে হুসাইন আল-খুযাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের এক মহিলা যেনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যেনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে বলে দিলেন ঃ "এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। সে সন্তান প্রসব করলে আমার নিকট নিয়ে আসবে।" সে লোকটি তাই করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যেনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তারপর তার শরীরের কাপড় ভালো করে বেঁধে দেয়া হলো এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো যেনা করেছে। তবুও আপনি তার জানাযার নামায পড়ছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সে এমন তওবা করেছে যে, তা চল্লিশজন মদীনাবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দিলেও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহ্‌র জন্য স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয় তার এরূপ তওবার চেয়ে ভালো কোন কাজ তোমার আছে কি" (সহীহ্ মুসলিম)'?

ইবনে ইসহাক (র) বনী মুস্তালিকের যুদ্ধের (৬ষ্ঠ হিজরীতে মুরাইসি নামক স্থানে সংঘটিত, এটা একটা কূপের নাম) বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের পর যখন এই কূপের কাছে পৌছেন, তখন কতক লোক পানি নেয়ার জন্য কূপের কাছে আসে। হযরত উমার (রা)-র কর্মচারী জাহানজাহ ইব্‌নে মাসউদও পানি নেয়ার জন্য নিজের ঘোড়া সামনে হাঁকিয়ে দেন। পানি পান করানোর ব্যাপার নিয়ে তার এবং সিনান ইব্‌নে ওয়াবার আল-জুহানীর মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেলো এবং উভয়ে অস্ত্র ধারণে উদ্যত হলো। জুহানী সাহায্যের জন্য আনসারদের ডাকলো এবং জাহানজা মুহাজিরদের ডাকলো। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই ইব্‌নে সালূল এতে ক্রোধান্বিত হলো। তার সাথে তার গোত্রের কতক লোকও ছিলো। যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রা)-ও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি ছিলেন যুবক। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইব্‌নে সালুল বললো, এই (মুহাজির) লোকেরা যা করতে চাচ্ছিল তা কি করে ফেলেছে? তারা আমাদের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়েছে এবং আমাদের এলাকায়ই আমাদের উপর ছেয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র শপথ! কুরাইশ পলাতকরা (মোনাফিকরা মুহাজিরদের পলাতক বলতো) আমাদের সাথে তাই করেছে, যেমন প্রবাদ আছে, 'তোমাদের কুকুরটা এতো মোটাতাজা হয়েছে যে, এখন তোমাদেরই খেয়ে ফেলবে'। আল্লাহ্‌র শপথ! যখন আমরা মদীনায় পৌছে যাবো তখন সম্মানিত লোকেরা অপমানিতদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিবে।"

অতঃপর সে নিজের সংগীদের সম্বোধন করে বলতে লাগলো, তোমরা নিজেরাই এই বিপদ নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছো। তোমরা তাদেরকে নিজেদের দেশে আসার অনুমিত দিয়েছো এবং নিজেদের ধন-সম্পদ তাদের মধ্যে বণ্টন করেছো। তোমরা যদি তখন তাদের সাহায্য না করতে তাহলে তারা কি অন্যদিকে চলে যেতো না ?

যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রা) এসব কথা শুনে ফেললেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে কথাগুলো জানালেন। এ সময় যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিলো এবং হযরত উমার (রা)-ও তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে আবেদন করলেন, এই ব্যক্তিকে (ইবনে উবাই) হত্যা করার জন্য আব্বাদ ইব্‌নে বিশর (রা)-কে হুকুম দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে উমার ! তা কি করে হতে পারে? লোকেরা

বলবে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছে। তুমি এখান থেকে রওয়ানা হবার ঘোষণা দাও। প্রস্থান করার জন্য তিনি এমন সময় নির্দেশ করলেন যখন সাধারণত তিনি সফর করেন না।

নির্দেশ মোতাবেক লোকজন রওয়ানা হয়ে গেলো। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই ইবনে সালুল বুঝতে পারলো যে, যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রা) তার মুখে যে কথা শুনেছিলেন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। তখন সে তাঁর কাছে এলো এবং শপথ করে বললো, আমি এরূপ কথা বলিনি। নিজের গোত্রের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত লোকেরা বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! খুব সম্ভব এই ছেলে তার কথা বুঝতে ভুল করেছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে কথা বলেছে তা সে মনে রাখতে পারেনি হয়তো। একথা মূলত আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সমর্থনে বলা হয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রওনা হলেন, উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহর শপথ! আপনি এ সময় কেন রওয়ানা হলেন? আপনি তো কখনো এরূপ সময় সফর করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি কি জানতে পারোনি যে, তোমার সাথী কি বলেছে ? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কোন্ সাথী ? তিনি জবাব দিলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। তিনি বললেন, সে কি বলেছে ? তিনি জবাবে বলেন ঃ "সে ধারণা করছে, সে যখন মদীনা পৌঁছবে তখন সম্মানিত লোকেরা অপমানিত ও নীচ লোকদের মদীনা থেকে বহিষ্কার করবে।

এই দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সংগীদের নিয়ে বিরতিহীনভাবে পথ চলতে থাকলেন। অতঃপর সারা রাত সফর করলেন। এমনকি পরদিন সূর্যের তাপ যখন অত্যন্ত প্রখর হলো, তখন তিনি যাত্রা বিরতি দিলেন। লোকেরা এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো যে, মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে তারা ঘুমিয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কৌশল এজন্য গ্রহণ করেছিলেন যাতে লোকদের দৃষ্টি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর মন্তব্য থেকে অন্য দিকে সরে যায়।

ইবনে ইসহাক (র) বলেন, এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার মতো অন্যান্য মোনাফিকদের লক্ষ্য করে 'সূরা মুনাফিকূন' নাযিল হয়। যখন এই সূরা নাযিল হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-র কান ধরে বলেন ঃ এই সেই যুবক যে নিজের কানের সাহায্যে আল্লাহ্‌র হক আদায় করেছে। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাইর পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-র কানেও তার পিতার ন্যাক্কারজনক মন্তব্য পৌঁছে গেলো।

ইব্‌নে ইসহাক (র) বলেন, আমার কাছে আসেম ইব্‌নে উমার ইব্‌নে কাতাদা (র) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি জানতে পারলাম, আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাইর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছেন। আপনি যদি তাই করতে চান তাহলে আমাকে হুকুম দিন, আমি তার মাথা কেটে আপনার সামনে নিয়ে আসবো। আল্লাহ্‌র শপথ! খাযরাজ গোত্রের লোকেরা জানে যে, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও নেই, যে তার পিতার সাথে আমার চেয়ে ভালো ব্যবহার করতে পারে। আমার আশংকা হচ্ছে, আপনি যদি তাকে হত্যা করার জন্য অপর কাউকে নির্দেশ দেন তাহলে আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে লোকদের মাঝে জীবিত বিচরণ করতে দেখে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না এবং তাকে হত্যা করে বসবো। ফলে একজন কাফেরের পরিবর্তে একজন মুমিনকে হত্যা করে জাহান্নামী হয়ে যাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ না, আমরা তার সাথে নরম ব্যবহার করবো এবং সে যতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবে তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো।

এই ঘটনার পর পরিস্থিতি এই দাঁড়ালো যে, আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই যখনই কোন অশোভনীয় কাজ করতো, তার নিজের লোকেরাই তাকে ধরপাকড় করতো এবং তার সাথে কঠোর ব্যবহার করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার এই অবস্থার কথা জানতে পারলেন তখন হযরত উমার (রা)-কে বললেন ঃ হে উমার! কি দেখছো? আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি যেদিন আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাইকে হত্যা করার কথা বলেছিলে সেদিন আমি যদি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে একটি বিরাট হাংগামা সৃষ্টি হতো। আর আজ যদি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেই তাহলে তার গোত্রের লোকেরা

তাকে হত্যা করে ফেলবে। উমার (রা) বলেন, আমি ভালো করেই জানতাম, আমার ফয়সালার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা অধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ, অধিক বরকতপূর্ণ।

ইকরিমা ইব্‌নে যায়েদ (র) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, সেনাবাহিনী যখন মদীনায় ফিরে আসে, তখন আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাইর পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তরবারি কোষমুক্ত করে মদীনার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা মদীনায় প্রবেশ করতে থাকলো। যখন তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই আসলো তখন তিনি বললেন, সামনে অগ্রসর হবে না। সে পুত্রকে বললো, কমবখত! তোর কি হয়েছে? পুত্র বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যতোক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি না হবে ততোক্ষণ এখান থেকে এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। কেননা সম্মান ও মহত্ব তাঁর কাছে এবং তুমি অপদস্থ ও নীচ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত সেনাবাহিনীর পিছনে থাকতেন, যাতে পিছনে থেকে যাওয়া লোক, পথ ভুলে যাওয়া লোক এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী লোকের দেখাশুনা করতে পারেন। যখন তিনি দ্বারদেশে পৌছলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই তাঁর কাছে পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে আপনার অনুমতি ছাড়া মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি যখন তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, আবদুল্লাহ (রা) তার পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন, অতএব তুমি এখন আসতে পারো।

মোনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাইর পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন নিষ্ঠাবান অনুগত সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলমানদের জন্য একটি উন্নত স্তম্ভ। নিজের পিতার আচরণে তিনি সব সময় দুঃখভারাক্রান্ত থাকতেন। তার অশোভনীয় কার্যকলাপে তিনি লজ্জিত ও ব্যথিত থাকতেন। পিতার প্রতি একজন সৎ ও দয়ালু পুত্রের যে আবেগ থাকার কথা, তা কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যেও ছিলো। এজন্য তিনি যখন অনুমান করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো তার পিতার মৃত্যুদণ্ড দিবেন, তখন তার মন বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি উত্তম ও

পবিত্র পন্থায় এবং বীরত্বের সাথে নিজের আবেগের মোকাবিলা করেন। তিনি ইসলামকে ভালোবাসতেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য পছন্দ করতেন। তিনি আন্তরিকভাবেই রাসূলের নির্দেশ কার্যকর হওয়া কামনা করতেন, তা তাঁর পিতার বিরুদ্ধেই হোক না কেন। কিন্তু এটাই তাঁর ধৈর্যের বাইরে ছিলো যে, কোন ব্যক্তি তার পিতাকে হত্যা করার পর সে তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াক। তার মনে ভয় ছিলো কখন তিনি আবার শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়ে না জানি জাহিলী যুগের প্রতিশোধ স্পৃহায় লিপ্ত হয়ে পড়েন।

এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে তাঁর কাছে নিজের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করেন এবং এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আবেদন জানান। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলেন, যদি আপনি নিশ্চিত আমার পিতার মৃত্যুদণ্ড দিতে চান তবে আমাকে নির্দেশ দিন, আমি তার মাথা আপনার সামনে হাযির করবো। তাহলে অন্য কেউ তাকে হত্যা করার সুযোগ পাবে না। কেননা অন্য কেউ যদি তার পিতাকে হত্যা করে, অতঃপর সে জীবন্ত তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তিনি আবেগের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করে বসতে পারেন। এমতাবস্থায় তিনি একজন মুমিনকে হত্যা করে জাহান্নামী হবেন।

এই হচ্ছে অন্তরের ভীতিকর অবস্থা। মানুষ যেভাবেই এবং যেদিক থেকেই এর মূল্যায়ন করবে, হতভম্ব না হয়ে পারে না। মানুষের অন্তরের উপর ঈমানের ভীতি-বিহবল অবস্থা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন জানাতে বাধ্য করে যে, মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজটি তার উপর ন্যস্ত করা হোক অর্থাৎ তার পিতার হত্যার ভার তাকেই দেয়া হোক। তিনি খালেস নিয়াতেই তাঁর কাছে এই আবেদন জানান। কারণ তিনি এই আবেদনের মাধ্যমে এর চেয়েও কঠিন কাজ এবং ভয়ংকর বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে চান। তা হচ্ছে ঃ তিনি মানবিক দুর্বলতার শিকার হয়ে এক কাফেরের পরিবর্তে একজন মুমিনকে হত্যা করে বসতে পারেন এবং এর ফলে জাহান্নামী হয়ে যেতে পারেন।

এ হচ্ছে সততা ও পবিত্রতার সৌন্দর্যমণ্ডিত ভীতি-বিহবল অবস্থা, পিতার ব্যাপারে তিনি মানবীয় দুর্বলতায় পতিত হয়েছিলেন, তিনি তার মোকাবিলা করছেন। এজন্য তিনি বলছেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! খাযরাজ গোত্রের লোকেরা জানে যে, পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রগণ্য কোন ব্যক্তি

নেই।" তাই তিনি তার নবী ও মহান পথপ্রদর্শকের কাছে আবেদন করছেন, তিনি যেন এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে এবং ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু তার আবেদনের অর্থ কখনও এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্দেশ তুলে নিবেন অথবা তা পরিবর্তন করবেন। কেননা তাঁর নির্দেশ সর্বাবস্থায় অবশ্য পালনীয়। তাঁর নির্দেশ যে কোন অবস্থায়ই হোক কার্যকর করতে হবে। বরং তার আবেদনের অর্থ এই যে, তাকেই হুকুম করা হোক, তিনিই নিজের পিতার মস্তক তার ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর সামনে হাযির করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বেলিত অন্তরের একজন মুমিনকে দেখছেন। অত্যন্ত প্রশস্ত মন দিয়ে মার্জিত ভংগিতে এই উদ্বেগের প্রতিকার করছেন। তিনি বলছেন ঃ না, সে যতোক্ষণ আমাদের সাথে আছে আমরা তার সাথে সদ্ব্যবহার করবো। এর পূর্বে তিনি হযরত উমার (রা)-কে তার সংকল্প থেকে বিরত রাখেন। তাঁকে তিনি বলেছিলেনঃ উমার! চিন্তা করো, এই পদক্ষেপ নেয়ার পর লোকেরা বলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের হত্যা করছে। তখন পরিস্থিতি কেমন হবে?

অতঃপর এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহান নেতার মতো প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেন। প্রথমত তিনি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ আগেই জারি করেননি এবং লোকেরা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাত্রা বিরতিও দেননি। যাতে দুই দ্বন্দ্বমুখর ব্যক্তির শ্লোগানে জাহিলিয়াতের যে আগুন জ্বলে উঠেছিলো তা নির্বাপিত হতে পারে। একজন ডাকলো, হে আনসারগণ! তোমরা কোথায়? অপরজন ডাকলো, মুহাজিরগণ ! আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসো। তাঁর অসময় যাত্রার এই কৌশল অবলম্বন করার আরেকটি উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিরোধের যে আগুন জ্বালিয়েছিলো তা থেকে মুসলমানদের বাঁচানো। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মানবেতিহাসের যে অতুলনীয় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চাচ্ছিলো।

এই ঘটনার সর্বশেষ দৃশ্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক আকর্ষণীয় হয়ে সামনে আসছে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) নিজের তরবারি কোষমুক্ত করে মদীনার প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান। যখন তার পিতা এলো, তিনি তাকে শহরে প্রবেশ করতে বাধা দিলেন। যাতে তার নিজের কথা, 'সম্মানিত লোকেরা

অপমানিতদের মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিবে', তার ব্যাপারে সত্য প্রমাণিত হয় এবং সে জেনে নিতে পারে যে, মান-সম্মানের অধিকারী হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সে হচ্ছে অপমানিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাকে শহরে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেননি, যাতে বাস্তবে প্রমাণিত হয় যে, কে সম্মানিত আর কে অপমানিত।

কেবল ঈমানই তাদেরকে সম্মান ও প্রতিপত্তির এই উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলো। অথচ সাহাবায়ে কিরামও মানুষই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মানবিক দুর্বলতাও ছিলো। তারপরও তারা এই উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিলো। ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য এবং সবচেয়ে বড়ো সত্য। মানুষ যখন এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে তখন সে নিজে এই সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতীক হয়ে সমাজের বুকে বিচরণ করবে।[১]

হযরত আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, একদা আমি হযরত আবু তাল্‌হা (রা), আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা), আবু দুজানা (র), মুআয ইব্‌নে জাবাল (রা) ও সুহাইল ইব্‌নে বাইদা (রা)-কে শরাব পরিবেশন করছিলাম। মদের নেশায় তাদের মাথা ঢুলছিলো। হঠাৎ একটি ঘোষণা দেয়া হলো, "শরাব হারাম ঘোষণা করা হয়েছে"। আনাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আসার অথবা আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি বাইরে চলে যাবার পূর্বেই আমরা প্রথম যে কাজটি করেছি তা ছিলো ঃ শরাব ঢেলে ফেলে দিয়েছি এবং এর পাত্রগুলো টুকরা টুকরা করে ভেঙ্গে ফেলেছি। অতঃপর আমাদের কেউ গোসল করলো, কেউ উযু করলো এবং উম্মে সুলাইম (রা)-র সুগন্ধি মেখে মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো (ইব্‌নে জারীর, তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর)

হযরত আবু বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা একটি মদের আসরে বসা ছিলাম। হঠাৎ আমি উঠে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে হাযির হলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। ইতিমধ্যে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশ এসে গেছে। আমি আমার সংগীদের কাছে ফিরে এলাম এবং তাদের সামনে মদ হারাম

---

১. এই ঘটনা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সায়্যিদ কুতুব শহীদ (র)-এর 'ফী জিলালিল কুরআন' শীর্ষক তাফসীর থেকে নেয়া হয়েছে (২৮ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১৪)।

হওয়া সম্পর্কিত আয়াত (সূরা মাইদা ঃ ৯০–৯১) 'ফাহাল আনতুম মুনতাহূন' পর্যন্ত পাঠ করে শুনালাম। তখনো কতক লোকের হাতে পানপাত্র ছিলো, যা থেকে তারা কিছু পান করেছে এবং বাকী কিছু আছে। নির্দেশ শুনবার সাথে সাথে সবাই পানপাত্র উপুড় করে দিলেন এবং বারবার বলতে থাকলেন, ইনতাহাইনা রব্বানা ইনতাহাইনা রব্বানা (হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিরত হলাম, তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর)।

"লোকদের ভয় দেখানের জন্য কোন সংস্থা কায়েম করারও প্রয়োজন হলো না, আর সরকারের মৃত্যুদণ্ড, কয়েদ অথবা মালক্রোকও করতে হলো না। বরং লোকেরা কুরআনের নির্দেশ শোনার সাথে সাথে স্বেচ্ছায় তা মেনে নিলো (মিনহাজুল কুরআন ফিত-তারবিয়াহ্‌, মুহাম্মাদ শাদীদ)।

সাফিয়্যা বিনতে শাইবা বলেন, একদা আমরা আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরাইশ মহিলা এবং তাদের গুণকীর্তন উল্লিখিত হলো। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, কুরাইশ মহিলাদের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ ! আনসার মহিলাদের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী এবং কুরআন মজীদের সত্যতা স্বীকার ও তার উপর ঈমানদার নারী আর দেখিনি। যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

"এবং তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে" (সূরা নূর ঃ ৩১), তখন তাদের পুরুষ লোকেরা বাড়ী ফিরে গিয়ে নারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, বোন এবং অপরাপর আত্মীয় মহিলাদের শুনাতে থাকেন। এই নির্দেশ শোনার সাথে সাথে প্রত্যেক মহিলা উঠে গিয়ে চাদর দিয়ে নিজেদের মাথা ঢেকে নিলো (আবু দাউদ)।

"মক্কার মুশরিকরা কতক মুসলমানকে হিরজত থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের বন্দী করে রাখে এবং তাদের পায়ে বেড়ী পরিয়ে দেয়। তাদেরকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য কঠিন শাস্তি দেয়। যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি হলো তখন তাতে স্থির হলো যে, মক্কার কোন ব্যক্তি যদি কাফেরদের কাছ থেকে পলায়ন করে মদীনায় চলে যায় তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাবেন। সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আবু বাশীর (উতবা ইব্‌নে উসাইদ) (রা) কোন রকমে কয়েদখানা থেকে পলায়ন করে

একাধারে সাত দিন পায়ে হেঁটে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। মক্কার মুশরিকরা হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুযায়ী তাকে ফেরত আনার জন্য দুই ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠায়। মুসলমানদের জন্য এটা ছিলো কঠিন পরীক্ষা। একজন যুবক মুসলমানকে কাফেরদের হাতে তুলে দিতে হবে, যারা এই কিছু দিন আগে পর্যন্তও তাকে নানারূপ বীভৎস শাস্তি দিয়েছিলো এবং ফের নিয়ে গিয়ে আরো কদর্য শাস্তির ব্যবস্থা করবে। পদব্রজে এতো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছার পর তার ধারণা ছিলো যে, তিনি শাস্তি থেকে বেঁচে গেছেন। তিনি একথা কল্পনাও করতে পারেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুশমনের হাতে সোপর্দ করবেন।

তিনি যখন তাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে কুরাইশ প্রতিনিধিদের কাছে সোপর্দ করলেন, তখন (আবু বাশীর) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আমাকে মুশরিকদের হাতে অর্পণ করছেন, আর তারা আমাকে মুসলমান হওয়ার অপরাধে শাস্তি দিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বাশীর ! আমরা মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি করেছি তা তোমার জানা আছে। আমাদের ধর্মে চুক্তি ভংগ করা জায়েয নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার ও তোমার মুসলমান সাথীদের জন্য কোন না কোন পথ বের করে দিবেন। আবু বাশীর (রা) স্তম্ভিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আমাকে তাদের হাওয়ালা করে দিবেন? তিনি বলেন, আবু বাশীর! চলে যাও। আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য কোন না কোন পথ বের করে দিবেন। অতঃপর তিনি তাকে কুরাইশ প্রতিনিধিদের কাছে অর্পণ করলেন (মিনহাজুল কুরআন ফিত-তারবিয়াহ, আল্লামা মুহাম্মাদ শাদীদ)।

কুফার এক ব্যক্তি হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, হে ভ্রাতুষ্পুত্র। সে জিজ্ঞাসা করলো, আপনারা (তাঁর সাথে) কি ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন? তিনি বলেন, আমরা (আল্লাহ্‌র পথে) চেষ্টা-সাধনা করতাম। একথা শুনে সে বলতে লাগলো, আমরা যদি সেই যুগে থাকতাম তাহলে তাঁকে জমীনের উপর হাঁটতে দিতাম না, বরং তাঁকে কাঁধে করে ফিরতাম। হুযায়ফা (রা) বলেন, ভাতিজা, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি যদি খন্দকের যুদ্ধের দিন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখতে! তিনি রাত পর্যন্ত নামাযে ব্যস্ত

থাকলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ "এমন কোন ব্যক্তি আছে যে দুশমনের শিবিরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে, অতঃপর ফিরে এসে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে ?" তিনি তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসার শর্ত আরোপ করলেন। তিনি দোয়া করলেন, "আমি আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করছি, যে ব্যক্তি এই কাজ করতে পারবে সে বেহেশতে আমার সাথী হবে"।

কিন্তু শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা, খাদ্যাভাব ও কঠিন শীতের কারণে কোন ব্যক্তিই এ কাজে প্রস্তুত হলো না। যখন কেউই স্বেচ্ছায় তৈরি হলো না, তিনি আমাকে স্মরণ করলেন। যেহেতু তিনি আমাকেই স্মরণ করেছেন, তাই উপস্থিত না হয়ে আর উপায় ছিলো না। তিনি নির্দেশ দিলেন, "হুযায়ফা! যাও শত্রুশিবিরে প্রবেশ করে দেখো এখন তারা কি করছে ? আমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু করবে না"।

হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি শত্রুশিবিরে ঢুকে পড়লাম এবং দেখতে পেলাম, ঝড়ো হাওয়া এবং খোদায়ী বাহিনী কাফেরদের সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দিয়েছে। তাদের হাঁড়ি-পাতিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, তারা আগুনও জ্বালাতে পারছে না এবং তাঁবুও খাটাতে পারছে না। এ সময় (কুরাইশ বাহিনীর অধিনায়ক) আবু সুফিয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হে কুরাইশ বাহিনী! প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার সাথীদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আবু সুফিয়ান পুনরায় বললো, হে কুরাইশ বাহিনী! আল্লাহ্‌র শপথ! এখন স্ব-স্থানে টিকে থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। আমাদের ঘোড়া ও উটগুলো হালাক হয়ে গেছে। বনু কুরইযা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি, বরং আমরা তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত মারাত্মক সংবাদ পেয়েছি। এদিকে যে ঝড়ো হাওয়া বইছে তা তোমরা স্বচক্ষেই দেখছো। হাঁড়ি-পাতিল চুলায় বসানো যাচ্ছে না, আগুনও জ্বালানো যাচ্ছে না, আর তাঁবুগুলোও খাটানো অবস্থায় রাখা যাচ্ছে না। অতএব তোমরা এখান থেকে রওয়ানা হও, আমি চললাম।

হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এলাম। তিনি তখন তাঁর কোন এক স্ত্রীর ইয়ামানী চাদর গায় দিয়ে নামায পড়ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি নিজের পায়ের কাছে বসালেন এবং চাদরের এক অংশ দিয়ে আমাকে আবৃত করে দিলেন। এ অবস্থায় তিনি রুকূ-সিজদা করলেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমি তাঁর কাছে সব বৃত্তান্ত

খুলে বললাম। কুরাইশদের সাহায্যের জন্য অগ্রসরমান বনূ গাতাফান পথিমধ্যে এ খবর শুনতে পেয়ে, তারাও ফিরে গেলো।

খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো, যতো বড়ো বিপদ-মুসীবত তাদের বরদাশ্ত করতে হয়েছিলো এবং এর প্রভাবে তাদের মধ্যে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিলো, কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত আয়াতে তার চিত্র তুলে ধরেছে ঃ

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا

"তখন ঈমানদার লোকদের যথেষ্ট পরীক্ষা করা হলো এবং সাংঘাতিকভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হলো" (সূরা আহযাব ঃ ১১)।

সাহাবাগণও মানুষই ছিলেন। আর মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। আল্লাহ্ তাআলা এই সামর্থ্যের অতিরিক্ত কষ্ট কাউকে দেন না।

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য পাবার পূর্ণ বিশ্বাস তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। তাছাড়া এসব পরিস্থিতি উপেক্ষা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইয়ামান, সিরিয়া ও পূর্ব-পশ্চিমে বিজয় সূচিত হওয়ার যে সুসংবাদ দিলেন, তাও তাদের সামনে ছিলো। এ সুসংবাদ সত্ত্বেও খন্দকের নাজুক পরিস্থিতি তাদেরকে ঘাবড়ে দিয়েছিলো।

এই পরিস্থিতির পূর্ণাংগ চিত্র হযরত হুযায়ফা (রা)-র বর্ণনায় ভেসে উঠেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন সাহাবাদের অবস্থা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তাদের অন্তরের ভাব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি, যে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করে তাদের অবস্থা জেনে আসতে পারে? একদিকে তিনি ফিরে এসে সংবাদ পৌছানোর শর্ত আরোপ করলেন, আর দ্বিতীয়ত এই কাজ সম্পাদনকারীর জন্য দোয়া করলেন, আল্লাহ যেন তাকে বেহেশতে তাঁর সংগী বানান। এর পরও কোন ব্যক্তি এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে সামনে এগিয়ে আসেনি। শেষে তিনি হুযায়ফা (রা)-র নাম উল্লেখপূর্বক তাকে ডাকলেন। যেমন হুযায়ফা (রা) বলেন, তখন এই নির্দেশ পালন করা ছাড়া আমার জন্য আর কোন উপায় থাকলো না। এখান থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, একান্ত নাজুক পরিস্থিতিতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু এই ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি এবং যে অনুভূতি আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার শিকার হওয়া থেকে নিরাপদ রাখে এবং আল্লাহ্‌র আইন স্থায়ী ও সন্দেহাতীত হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে তাও জীবন্ত ছিলো। এজন্য তাদের আত্মবিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহ্‌র নীতির একটি দিক যখন কার্যত সামনে এসে গেছে তখন তার প্রতিশ্রুত ফলাফলও নিশ্চিতরূপেই প্রকাশ পাবে। এরই ভিত্তিতে তাদের মনে পূর্ণরূপে এই বিশ্বাস বিদ্যমান ছিলো যে, এই ভয়ংকর পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত বিজয় ও সফলতার কারণে পরিণত হবে। এজন্য তারা আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াতকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ·

"তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা অতি সহজে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমিত পাবে, অথচ তখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদাপদ) আবর্তিত হয়নি ? তাদের উপর বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ আবর্তিত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করা হয়েছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানিন্তন রাসূল ও তার সংগী-সাথীগণ আর্তনাদ করে উঠেছে (এবং বলেছে), আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসবে ? তখন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে" (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)।

এই সেইসব লোক যাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিলো এবং এ কারণেই অতি দ্রুত তাদের কাছে আল্লাহ্‌র সাহায্য পৌছে গিয়েছিলো। আর তারা বলে উঠলেন ঃ

هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ·

"এই তো সেই জিনিস যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের নিকট করেছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা সম্পূর্ণ সত্য ছিলো। এই ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি করে দিলো" (সূরা আহযাব ঃ ২২)।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যেন তাদের সাথে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তারা যদি এই ভয়ংকর পরিস্থিতি, এই মহাবিপদ ও সংকট মোকাবিলা করতে পারেন তবে এর ফল আল্লাহ্র সাহায্য হিসাবে প্রকাশ পাবে। এজন্য অবশ্যই আল্লাহ্র সাহায্য আসবে। 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা সম্পূর্ণ সত্য', এর অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব নিদর্শনের কথা বলেছিলেন তা সত্য ছিলো। তাঁদের বাতানো ফলও (সাহায্য) সত্য প্রমাণিত হয়েছে। উপরন্তু তাদের অন্তর আল্লাহ্র সাহায্য ও তাঁর ওয়াদার উপর পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলো। "এই ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি করে দিলো" কথার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

সাহাবাগণও ছিলেন মানুষ। তাই তাদের মানসিক দুর্বলতা ও আবেগ-অনুভূতি সবই ছিলো। তাদের কাছে কখনো এই দাবি করা হয়নি যে, তাদেরকে মানবীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে হবে এবং মানবীয় পরিধি উল্লংঘন করে মানবীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে হবে। কেননা তাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবতার লালন-পালন করা। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তারা মানুষ হয়ে থাকবে এবং তাদের উপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা মানুষ হিসাবে পালন করবেন। তাদেরকে জিন, ফেরেশতা, চতুষ্পদ জন্তু বা পাথর বানানো হয়নি। অতএব তারা মানসিক দুর্বলতার কারণে ভীত-সন্ত্রস্তও হয়ে পড়তেন, বিপদের সময় মনের মধ্যে সংকীর্ণতাও অনুভব করতেন এবং এ ধরনের বিপদ ধারণ ক্ষমতার অধিক হলে তাদের ঘাড় নুজ হয়ে পড়তো। কিন্তু এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহ্র সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো গভীর এবং মজবুত যা তাদেরকে বাঞ্ছিত মান থেকে নিচে পতিত হতে দিতো না। নতুন উদ্যম-উৎসাহ তাদেরকে নিরাশার গ্লানি থেকে হেফাজত করতো। এভাবে তারা মানবেতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিরাজ করছেন যার নজীর পৃথিবীর ইতিহাস পেশ করতে পারেনি।

এখন আমাদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, আমরা যেন এ কথাগুলো হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করি, তাহলে ইতিহাসের এই অতুলনীয় দৃষ্টান্তগুলো সহজেই অনুধাবন করতে পারবো। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তারাও ছিলেন মানুষ এবং মানবীয় দুর্বলতা ও সৌন্দর্যের উর্ধে ছিলেন না। তবে তাদের ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা মানবতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষ হয়েছেন।

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়েয ইবনে মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বলেনঃ হে নাদান! ফিরে যাও, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর কাছে তওবা করো। অতএব তিনি চলে গেলেন এবং কিছু দূর গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। এভাবে তিনি যখন চতুর্থবার ফিরে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি করেছো যা থেকে আমি তোমাকে পবিত্র করবো? তিনি বলেন, যেনার অপরাধ থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি কি পাগল? তাকে জানানো হলো, সে পাগল নয়। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি শরাব পান করেছে নাকি? তখন এক ব্যক্তি তার মুখ শুঁকলো কিন্তু শরাবের কোন গন্ধ পেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি সত্যিই কি যেনা করেছো? তিনি বলেন, হাঁ। এ কথার উপর তিনি তাঁকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করার নির্দেশ দিলেন।

এই ঘটনার দুই অথবা তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেন ঃ তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। সে এমন তওবা করেছে যে, তা যদি একটি জাতির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় তবে এটা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

অনুরূপভাবে আয্দ গোত্রের উপশাখা গামিদ গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বলেন ঃ আহা! চলে যাও, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর কাছে তওবা করো। সে বললো, আপনি কি মায়েয ইব্নে মালেকের মত আমাকেও ফিরিয়ে দিতে চান ? আমি তো যেনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে পড়েছি। তিনি বলেন ঃ সত্যিই? সে বললো, হাঁ। তিনি তাকে বলেন ঃ সন্তান প্রসব করার পর এসো।

বুরাইদা (রা) বলেন, এক আনসার সাহাবী সেই মহিলার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সে সন্তান প্রসব করলো। অতঃপর আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, গামিদ গোত্রের মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এখন

তাকে রজম করা যাবে না। কেননা তার বাচ্চা এখনো ছোট, কে তাকে দুধ পান করাবে ? এক আনসার ব্যক্তি বললো, আমি তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর তার উপর রজমের শাস্তি কার্যকর করা হলো।

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এখন চলে যাও, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এসো। অতএব সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে এলো। তিনি বলেন ঃ এখন নয়, যখন সে দুধ পান ছেড়ে দিবে তখন আসবে। অতঃপর বাচ্চা যখন দুধপান ছেড়ে দিলো তখন সে বাচ্চাকে সাথে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। এ সময় বাচ্চার হাতে রুটি ছিলো। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি তার দুধপান ছাড়িয়েছি, এখন সে রুটি খেতে পারে। অতঃপর তিনি এই বাচ্চাটিকে এক সাহাবীর তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করলেন এবং ঐ মহিলা সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন তার জন্য এতোটা গভীর গর্ত খুঁড়তে যাতে তার বক্ষদেশ পর্যন্ত মাটির নিচে ডুবে যায়, অতঃপর তাকে রজম করতে হবে। যখন তাকে রজম করা হচ্ছিল তখন হযরত খালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তার মাথার উপর পাথর নিক্ষেপ করলেন। ফলে রক্তের ছিটা তার মুখে পড়লো এবং তিনি তাকে বদদোয়া দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদদোয়া করতে নিষেধ করলেন এবং বলেন ঃ খালিদ! বিরত থাকো, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! সে এমন তওবা করেছে, যদি কোন কর আদায়কারী এরূপ তওবা করতো তাহলে তাকেও মাফ করে দেয়া হতো। অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং তা পড়া হলো। অতঃপর তাকে দাফন করলেন।

"বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউনুস ইব্‌নে উবায়েদ (রা)-এর দোকানে বিভিন্ন প্রকার কাপড় ছিলো যার মূল্য দুই শত দিরহাম থেকে চার শত দিরহাম পর্যন্ত ছিলো। একদা তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দোকানে বসিয়ে নামায পড়তে গেলেন। ইতিমধ্যে এক বেদুইন এসে চারশো দিরহাম মূল্যের কাপড় চাইলো। সে তাকে দুইশো দিরহাম মূল্যের কাপড় দেখালো এবং তা তার পছন্দ হলো। অতএব সে তা চারশো দিরহামে ক্রয় করলো। বেদুইন কাপড় কিনে চলে যাচ্ছিল, পথিমধ্যে ইউনুসের সাথে তার দেখা। তিনি তার দোকানের কাপড় চিনতে পেরে এর দাম জিজ্ঞেস করলেন। বেদুইন বললো, চারশো দিরহাম। তিনি বলেন, এর দাম দুইশো দিরহাম। অতএব তুমি গিয়ে এটা ফেরত দাও। বেদুইন বললো,

আমাদের এলাকায় এ কাপড় পাঁচশো দিরহামে বিক্রয় হয়। আর আমি স্বেচ্ছায় উল্লিখিত মূল্যে তা খরিদ করেছি। ইউনুস বলেন, আমার সাথে দোকানে চলো। আমাদের ধর্মে অপরের কল্যাণ কামনা দুনিয়া ও তার মধ্যকার যাবতীয় সম্পদের চেয়ে উত্তম। অতঃপর তিনি তাকে নিজের দোকানে এনে দুইশো দিরহাম ফেরত দেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই বলে তিরস্কার করলেন যে, এতো মুনাফা গ্রহণ করতে তোমার কি লজ্জা হয় না, আল্লাহ্‌র ভয় মনে জাগ্রত হয় না ? সে উত্তরে বললো, লোকটি স্বেচ্ছায় এই মূল্যে খরিদ করেছে। তিনি বলেন, তুমি নিজের জন্য যা ভালো মনে করো তার জন্য সেটা ভালো মনে করলে না কেন ?

اَلْمُسْلِمُ يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه

"মুসলমান নিজের জন্য যা পসন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী, আহমাদ)।"[২]

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۔ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۔

"হে নবী! তোমাদের স্ত্রীদের বলো, তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যই পেতে চাও তাহলে এসো, আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখেরাতের ঘর পেতে চাও তাহলে জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন" (সূরা আহযাব ঃ ২৮-২৯)।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য এবং নিজের পরিবারের লোকদের জন্য এমন পরিমাণ জীবিকা বেছে নেন যাতে কোন রকমে দিন চলে যেতে পারে। তার কারণ এই ছিলো না যে, তিনি বিলাসবহুল জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করতে অপারগ ছিলেন। বরং তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আখেরাতে প্রাপ্তব্য নিয়ামতের আশায় এবং দুনিয়ার ভোগসামগ্রী থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকার জন্য এ ধরনের জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছিলেন। কেননা তাঁর জীবদ্দশায়ই আরবের অনেক এলাকা বিজিত

২. উস্তাদ আবদুর রহমান আযযামের 'আর-রিসালাতুল খালিদাহ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

হয়েছিলো এবং তাতে অঢেল সম্পদ হস্তগত হয়েছিলো। কর থেকেও প্রচুর আয় আসতো। ফলে দরিদ্র লোকেরাও অজস্র সম্পদের মালিক হয়ে গিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালী এই ছিলো যে, মাসের পর মাস তাঁর চুলায় আগুন জ্বলতো না। অথচ অভাবীদের বৃষ্টির ন্যায় দান খয়রাত করতেন। সব সময় উপঢৌকন, তোহফা ও সদকা দান করতেন। তাঁর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য এ ধরনের জীবনযাত্রা অবলম্বনের কারণ এই ছিলো না যে, তিনি নিজের আকীদা-বিশ্বাস বা শরঈ আইনের ভিত্তিতে তা করতে বাধ্য ছিলেন। কেননা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত পবিত্র বস্তুই হালাল। আর হালাল ও পাক জিনিসকে তিনি নিজের জন্য কখনো হারাম করেননি। তিনি উম্মতের জন্যও তাঁর মতো কষ্টের জীবন গ্রহণে বাধ্য করেননি। তবে যদি কেউ পার্থিব স্বাদ আস্বাদন থেকে বিরত থেকে স্বাচ্ছন্দের জীবন স্বেচ্ছায় পরিহার করে তাহলে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

কিন্তু তাঁর স্ত্রীগণ নারীই ছিলেন, মানুষই ছিলেন এবং তাঁদেরও মানুষের মতোই আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনা ছিলো। নিজেদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি নিকটে থাকা সত্ত্বেও পার্থিব আরাম-আয়েশের স্বাভাবিক আকর্ষণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। অতএব তারা যখন দেখলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের ফলে এ সময় সমাজের মধ্যে প্রাচুর্য এসে গেছে, তখন তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খোরপোষ বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তিনি এ আবেদন পছন্দ করলেন না, বরং এতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। কেননা তিনি চাইতেন, তিনি যে জীবনধারা অবলম্বন করেছেন, তাঁর স্ত্রীগণও সেই জীবনধারা গ্রহণ করুক এবং যাবতীয় পার্থিব পংকিলতা থেকে মুক্ত থাকুক। তাঁর এ ধরনের জীবনধারা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য এই ছিলো না যে, জীবনোপকরণের বিষয়গুলো হালাল-হারামের প্রশ্নের সাথে জড়িত। কেননা হালাল ও হারাম জিনিসগুলো তো সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। বরং তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তাঁর স্ত্রীগণ দুনিয়ার ভোগলালসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র থাকুক।

স্ত্রীদের পক্ষ থেকে খোরপোষের বরাদ্দ বাড়ানের দাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতোটা দুঃখিত ও হৃদয় ভারাক্রান্ত করেছিলো যে, তিনি

কিছু দিনের জন্য সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত বন্ধ করে দিলেন। আর এই পরিস্থিতি, সাহাবীদের জন্য দুনিয়ার অন্য সব বিপদের তুলনায় অধিক অসহনীয় ছিলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হতেন, কিন্তু সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়া যেতো না।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বাক্‌র (রা) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। লোকেরা তাঁর দরজায় ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। অতঃপর উমার (রা) এসে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তাঁকেও অনুমতি দেওয়া হলো না। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁদের উভয়কে অনুমদি দান করলেন। অতএব তারা দু'জন ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর চারপাশে সমবেত ছিলেন। তিনি চুপ করে বসে আছেন। উমার (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কথা শুনাবো যে, আশা করি তিনি হেসে দিবেন। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি যায়েদের কন্যাকে (উমারের স্ত্রী) আজ আমার কাছে খোরপোষ দাবি করতে দেখতেন তাহলে আমি তার মাথা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর সামনের পাটির দাঁত দেখা গেলো। তিনি বলেন ঃ এই যে এরা আমার চারপাশে বসে আছে, আমার কাছে খোরপোষ দাবি করছে।

অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) উঠে গিয়ে আয়েশা (রা)-কে মারার জন্য উদ্যত হলেন এবং উমার (রা) হাফসা (রা)-এর দিকে ছুটলেন। তারা উভয়ে বলছিলেন, তোমরা দু'জনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন জিনিস দাবি করছো যা তাঁর কাছে নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উভয়কে থামালেন। স্ত্রীগণ তখন বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আজকের পর থেকে আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন কিছু চাইবো না যা তাঁর কাছে নেই। রাবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ যখন স্ত্রীদের রাখা বা না রাখার এখতিয়ার সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলেন ঃ তোমার সাথে আমি একটি কথা বলতে চাই। আমি আশা করি তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করেই তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নিবে না। আয়েশা

(রা) বলেন, সেটি কি কথা? তখন তিনি তাকে উল্লেখিত আয়াত (আহযাব ঃ ২৮-২৯) পাঠ করে শুনান। আয়েশা (রা) বলেন, আমি কি আপনার সম্পর্কে আমার পিতা-মাতার কাছ থেকে পরামর্শ নিবো? না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই বেছে নিলাম। আমি আপনার কাছে আবেদন করবো, আমি কোন্ জিনিস বেছে নিয়েছি তা আপনি আপনার অন্য স্ত্রীদের বলবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কাউকে অসুবিধার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠাননি। বরং তিনি আমাকে শিক্ষক হিসাবে এবং সহজতা বিধান করার জন্য পাঠিয়েছেন। আমার স্ত্রীদের মধ্যে যে-ই তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে আমি তাকে সঠিক কথা বলবো।"

এ ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা করা একান্ত দরকার। এই ঘটনা একদিকে জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভংগীর চিত্র তুলে ধরেছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতকে অনুভব করার জন্য সচেতন কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে। তা দুনিয়া ও আখেরাতের মূল্যবোধসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং জমীন ও আসমানের কোন একটির দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মন থেকে যে কোন ধরনের সংশয়-সন্দেহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ইতস্ততবোধকে দূর করে দেয়। তা মুমিন ব্যক্তির মনকে অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং এ পথের যাবতীয় বাধাকে দূরীভূত করে।

অপরদিকে এই ঘটনা আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। এই চিত্রের সবচেয়ে সুন্দর দিক এই যে, এই জীবনযাত্রাও ছিলা মানুষেরই জীবনযাত্রা, এমন লোকদের জীবনপ্রণালী যারা নিজেদের উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও মানবিকতা ও মানবিক আবেগের বশবর্তী হয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যাননি। বরং তাদের মানবিক আবেগ-উত্তেজনা সাধারণ পর্যায় থেকে উন্নত হয়ে যে কোন ধরনের মলিনতা থেকে পাক হয়ে যায় এবং শুধু মানব প্রকৃতির এমন একটি সুন্দর কাঠামো অবশিষ্ট থেকে যায় যা পূর্ণতার চরম শিখরে পৌছে গিয়েছিলো (ফী যিলালিল কুরআন, খণ্ড ২১, পৃ. ৬-৮)।

উপরে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলো যার মধ্যে একদিকে রয়েছে অতুলনীয় গুণাবলী ও যোগ্যতা, অপরদিকে রয়েছে মানবিক দুর্বলতা, তা আমাদের সামনে প্রথম

যুগের মুসলিম সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে। তারা ইসলামের সঠিক অর্থ হৃদয়ংগম করে তদনুযায়ী জীবনকে গড়ে তোলেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র দীনের দাবিসমূহকে সঠিক অর্থে ও পূর্ণরূপে কবুল করে নিয়েছিলেন। তারা ইসলামের সঠিক অর্থকেও হৃদয়ংগম করে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের দায়িত্বসমূহকেও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যা মুসলমান হওয়ার কারণে তাদের উপর অর্পিত হয়েছিলো।

কথা মূলত এতটুকুই নয় যে, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য ইসলাম তাদের উপর কতিপয় দায়িত্ব আরোপ করেছে। বরং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যাপারটির স্বরূপ এই যে, মানুষ যদি প্রকৃত অর্থেই মানুষ হতে চায় তাহলে তার আসল দাবি কি ? মানুষ তো কেবল একটি পেট সর্বস্ব জীব নয় যে, মন যা চায় সে তাই করে বেড়াবে, প্রবৃত্তির দাবি অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের তোয়াক্কা করবে না এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হওয়ার মর্যাদা অনুধাবন করবে না।

প্রথম যুগের মুসলমানদের মতো কোন মানুষকে যাচাই-বাচাই করার জন্য একটি মাত্র মানদণ্ড রয়েছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কুরআন এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। তারা এই মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে উন্নত করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, একটি অপরাজেয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে দুনিয়া পরিচালার ভার নিজেদের হাতে নিতে হবে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হওয়ার সঠিক মর্যাদায় সংস্থাপন করার নামই হচ্ছে ইসলাম। সে মানুষকে তার মধ্যে নিহিত শক্তি ও যোগ্যতার সাথে পরিচিত করায়, অতঃপর এই শক্তি ও যোগ্যতাকে সুসংগঠিত করে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী কাজ করার জন্য ব্যবহার করে, যাতে সে নিজের প্রকৃত আকার ও আকৃতি লাভ করতে পারে এবং কেবল ক্ষুদ্র ও সীমিত বস্তুগত শক্তি হয়েই না থেকে যায়। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ও প্রেরিত দূতের কাছ থেকে হেদায়াত লাভ করে ইসলাম বিশ্বের বুকে একটি অতীব প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

অনুরূপভাবে মানুষের দ্বারা এমন অবিস্মরণীয় কাজ হতে পারে, প্রথম যুগের মুসলিম সমাজে যার প্রকাশ ঘটেছিলো এবং যার নমুনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত এই যে, দুনিয়ার বুকে মানবজীবনকে

আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে সমুন্নত করার জন্য তারা এই মহান প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং মানবজীবনকে বস্তুগত, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সবদিকেই একটি পবিত্র মানদণ্ড অনুযায়ী উন্নত করেছিলেন। এখানে কল্যাণ ও প্রাচুর্য গুটিকয়েক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং সবার জন্যই এই সুযোগ লাভ করার দরজা পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ছিলো, এমনকি সমাজে যারা অমুসলিম ছিলো তারাও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেনি।

এই ছিলো ঈমানের উন্নততম চিত্র, এই ছিলো মানুষের উন্নত স্তরে আরোহণের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, মানবিক প্রকৃতি ও স্বভাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা এই উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে, এই সমাজের মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মের শক্তিকে সবদিকে ও সব ময়দানে প্রসারিত হওয়ার যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিলো। তারা মানবিক পর্যায়ে অবস্থান করে এবং নিজেদের মানবিক বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে মানবতার উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই দৃষ্টান্তমূলক সমাজ কিভাবে হকের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লো? শেষ পর্যন্ত ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার এই অবর্ণনীয় অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হলো? আর মুসলমানদের মন-মগজে ইসলামের ব্যাপক অর্থ কিভাবে সংকুচিত হয়ে ঢুকে পড়লো? আজ তারা ইসলাম বলতে কয়েকটি ধরাবাধাঁ ইবাদতকে মনে করে। তারা মনে করে এই নির্দিষ্ট ইবাদত কয়টি আদায় করলেই যথেষ্ট। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ইবাদতগুলোও প্রতিপালিত হচ্ছে না, বরং মনে করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করার জন্য নেক নিয়াত থাকাই যথেষ্ট। আর প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলে তো প্রকাশ্যেই দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয় এবং এর সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। এই অবস্থা এজন্য সৃষ্টি হয়েছে যে, মুসলমানদের মনে কোন ভয়ানক বিচ্যুতি অনুপ্রবেশ করেছে।

মুসলিম সমাজের আসল রূপ এবং বর্তমানে আমরা যে সমাজে বাস করছি তার অবস্থার সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, দু'টি সমাজের মাঝে ভয়ংকর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ থেকে আমরা প্রকাশ্যেই জানতে পারবো যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং ইসলামের মাঝে কতো ব্যাপক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে! বর্তমান সময়ে ইসলামের মধ্যে এমন কিছু আওয়াজ উত্থিত হচ্ছে যা ইসলামের

দিকে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানায়। ইসলামী দুনিয়ায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতক মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা ইসলামের সঠিক অর্থের সাথে পরিচিত এবং অনৈসলামী সমাজে অবস্থান করেও যতোদূর সম্ভব ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করছেন এবং অন্যদের আহবান জানাচ্ছেন, এরাও তাদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করুক।

অনুরূপভাবে এটাও পরিষ্কার কথা যে, মুসলিম সমাজ এবং ইসলামের প্রকৃত দাবি ও অর্থের উপর কতিপয় শক্তিশালী কার্যকারণ প্রভাবশালী হয়ে আছে, যার কারণে এই সমাজের বর্তমান এই দুরবস্থা চলছে। কেননা এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, কোন শক্তিশালী কার্যকারণের প্রভাব ছাড়াই এ শক্তি (ইসলাম) নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এটাও অস্বাভাবিক ব্যাপার যে, মানুষ নিজের শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে কোন কারণ ব্যতিরেকে ভুল অনুমান করে উচ্চতর মর্যাদা ও বিজয়ীর স্থান থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার স্তরে পতিত হবে। নিশ্চিত কতগুলো ধ্বংসাত্মক কার্যকারণ ছিলো যেগুলো অতি সংগোপনে কাজ করে ইসলামী সমাজের অস্তিত্বকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলেছে। অতএব আমরা এখন খতিয়ে দেখবো, এই বিচ্যুতির সূচনা কিভাবে হয়েছিলো এবং কিভাবে তা ব্যাপকতর হতে থাকে।

৩

বিচ্যুতির সূচনাবিন্দু

বিচ্যুতির সূচনা কিভাবে হলো এবং কিভাবে তা বিস্তার লাভ করলো? দুনিয়া থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর এবং সরাসরি তাঁর সাহচর্য লাভের প্রভাব থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত হওয়ার পরও দীর্ঘকাল ধরে ইসলামী সমাজের উন্নত ও উচ্চতর মানের উপর কায়েম থাকা সম্ভব ছিলো কি?

আমরা যদি এই প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেই তাহলে এটা বাস্তব সম্মত জবাব হবে না। আর এ কথাও বাস্তব সম্মত হতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এবং তাঁর সাহচর্যের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামী সমাজ তার ভিত্তিমূল থেকে সরে গিয়ে চৌচির হয়ে গিয়েছিলো। এ কথা শুধু বাস্তবতারই পরিপন্থী নয়, বরং এরূপ কথা আমাদের ঈমানেরও পরিপন্থী।

এটা বাস্তবতার পরিপন্থী এজন্য যে, এক্ষেত্রে আমরা যেন বলতে চাচ্ছি, জীবনের উন্নত দৃষ্টিভংগী, মূলনীতি ও মূল্যবোধের উপর মানুষের ঈমান খুব কম থেকে থাকে এবং এই দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে হলে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি যখন দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তার সাথে সাথে ঈমানও শেষ হয়ে যায়। এরূপ কথা বললে আমরা মানুষের যোগ্যতা, মর্যাদা ও মূল্যকে খাটোই করবো। শুধু মর্যাদা ও মূল্যকেই খাটো করে ফেলবো না, বরং আমরা বিশ্ব ইতিহাসে মানুষের অবদান সম্পর্কে অনবহিতির প্রমাণও দিয়ে থাকবো। কেননা মানবজাতি তাদের ইতিহাসে জীবনের উন্নত দৃষ্টান্ত পেশ করেছে এবং মর্যাদা, মূল্যবোধ ও মূলনীতির উপর কেবল ঈমানই আনেনি, বরং তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করতে থাকে। তা করতে গিয়ে তারা অসহনীয় দুঃখ-কষ্টও ভোগ করে। উপরন্তু আমরা এরূপ কথা বলে এই সত্যকেও অস্বীকার করার অপরাধে অপরাধী হবো যে, ইসলাম এক হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে দুনিয়ার বুকে একটি জীবন্ত শক্তি হিসাবে বিরাজ করেছে।

আর এ কথা ঈমানের পরিপন্থী এজন্য যে, আমরা যেন এই ধারণা করছি, আল্লাহ তাআলা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এই যে ব্যবস্থা করলেন, নিজের কিতাব নাযিল করলেন, নিজের রাসূলকে পাঠিয়ে এই কিতাবের দিকনির্দেশ অনুযায়ী একটি উম্মাত গঠনের এবং কিতাবের বিধান ও এই বিধানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব এই রাসূলের উপর অর্পণ করলেন এবং কিতাবের মধ্যে এই যে আইন-কানুন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, এসব ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা শুধু কয়েকটি বছর অথবা কয়েক দশকের জন্য আকস্মিকভাবে করেছিলেন। এরূপ ধারণা করা এতোই অর্থহীন ও অশোভনীয় যে, এই ধরনের কথা পৃথিবীর কোন কোন মরণশীল মানুষ সম্পর্কেও বলা অযৌক্তিক। আর আল্লাহ সম্পর্কে, যিনি জীবন এবং গোটা বিশ্বলোকের স্রষ্টা, এরূপ ধারণা করা কতো মারাত্মক এবং ভয়ংকর ব্যাপার !

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর সংসর্গের প্রভাব লোকদের অন্তর থেকে মুছে যাওয়া এবং এর ফলে মুসলিম সমাজের নিজের ভিত্তিমূল থেকে সরে গিয়েছে বলে ধারণা করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক কথা। এটা কখনো সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সমাজ-সভ্যতা যে মানে পৌঁছে গিয়েছিলো, সেই মান অটুট থাকার চিন্তা করাটাও অনুরূপ একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পতন ও অবনতির সূচনা হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

সুতরাং যা হয়েছিলো তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো দিন মুসলমানদের মাঝে বর্তমান ছিলেন, সাহাবাগণ তাঁর সাহচর্যের ফায়দা লাভ করে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু সমাজ যখন তাঁর প্রত্যক্ষ সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হলো, তখন লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে। আর এই সীমার মধ্যে অবস্থান করে ইসলামের নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে থাকে। ইসলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তি সত্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। আর এই পার্থক্যটা হচ্ছে তাই যা হযরত আবু বাক্র (রা) সত্য কথা বলার ভংগীতে বর্ণনা করেছিলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ .

"হে জনগণ! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মাদের ইবাদত করে থাকে, তার জানা উচিৎ তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তার জানা উচিৎ আল্লাহ হচ্ছেন চিরঞ্জীব সত্তা, তাঁর মৃত্যু নেই।"

আর ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্‌র কলেমা, এজন্য তা চিরকাল জীবন্ত থাকবে এবং তার মৃত্যু নেই।

মানুষের অন্তরের মধ্যে ইসলামের প্রভাব চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। কেননা ইসলাম চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের অন্তরের যোগাযোগকে মজবুত করে। আর এ কারণেই মানুষ আল্লাহ তাআলার নির্দেশের আনুগত্য করে এবং নিজেকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের প্রভাব তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো না। মানুষ যতো দিন তাঁর থেকে বরকত হাসিল করার জন্য নিজের অন্তরের দরজা উন্মুক্ত রাখবে ততো দিন তাঁর উত্তম আদর্শ, তাঁর পথনির্দেশ বর্তমান থাকবে।

এ কারণে তাঁর ইন্তেকালের পরও লোকেরা মুসলমানই ছিলো। যদিও একথা সত্য যে, ইসলামের ইতিহাসে দৃষ্টান্তমূলক সমাজ সব সময় বর্তমান ছিলো না। কেননা আল্লাহ্‌র চিরন্তন নীতি অনুযায়ী দুনিয়ার কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু একটা দৃষ্টান্তমূলক যুগের একবার অস্তিত্বমান হওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন ছিলো, যাতে সব সময় একটি আলোকোজ্জ্বল চিত্র দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান থাকে এবং অনাগত মানব সভ্যতা তার অনুসরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে। তাঁর অনুসারীগণ কালের পরিক্রমায় এই উচ্চ ও উন্নত মানে পৌঁছে ইসলামকে নতুন জীবন ও শক্তিতে বলীয়ান করবে, কালের পরিবর্তন যতোই হোক, সফরের পথ যতো দীর্ঘই হোক, আর লোকেরা এ পথ থেকে যতোই বিচ্যুত হোক, কিন্তু এই লোকেরা অন্যদের সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে থাকবে। গত চৌদ্দ শত বছরের আলো-আঁধারের ক্রমাগত আগমন এই বাস্তব সত্যেরই প্রমাণ।

মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আল্লাহ যতো দিন চান, ইসলামী সমাজ ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

থাকবে, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে তা বিস্তার লাভ করতে থাকবে এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহকে ঠিক রেখে ইসলামের তাৎপর্য অনুযায়ী জীবন যাপন করতে থাকবে।

এ এক বাস্তব সত্য যে, এই পরিকল্পনা অনেক দূর পর্যন্ত সফল হয়েছিলো এবং ইতিহাসের এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই সমাজ ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী চলতে থেকেছে। যদিও এটা সত্য যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগের উচ্চতম মান বজায় থাকেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী সমাজ, প্রচলিত জীবন ব্যবস্থা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ, যার সাথে পৃথিবী পরিচিত ছিলো, তার তুলনায় সব সময়, সর্বাবস্থায় সীমাহীন উচ্চ ও উন্নত ছিলো।

ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ Wiferd Cantwlel Smith-সহ আরো কয়েকজন প্রাচ্যবিদের অভিমত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। তাদের মতে বর্তমান সভ্যতা ইসলাম থেকেই আলো গ্রহণ করে উন্নতির এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। কতক মুসলমানের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইসলামের প্রাণশক্তিও শেষ হয়ে গেছে। অবশ্য একথা সত্য যে, খাইরুল কুরূন বা কল্যাণময় যুগের পর ইসলামের ইতিহাসের অতুলনীয় যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিলো এবং প্রথাসিদ্ধ যুগের সূচনা হয়েছিলো। এই যুগ যদিও কেবল ইসলামের মানদণ্ডের দিক থেকে প্রথাসিদ্ধ ছিলো, কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাসের দিক থেকে তা গোটা জমীনের বুকে উন্নততর যুগ ছিলো।

বিচ্যুতির সূচনা ঃ উমাইয়্যা যুগ

এ এক বাস্তব সত্য যে, খেলাফতে রাশেদার যুগ শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথেই বিচ্যুতির সূচনা হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ বনু উমাইয়্যার যুগে যখন বংশীয় রাজতন্ত্রের ধারার অত্যাচার-নির্যাতন ও আধিপত্য বিস্তার শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং আমীর-ওমরা ও বাদশাদের পোষ্যগণ বিরাট জায়গিরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো, তখন থেকে সরকারী রাজনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার ইসলামী মূলনীতিতে ফাটল ধরে যায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে সামগ্রিকভাবে ইসলামী পরিবেশ বিরাজিত ছিলো। বিকৃতি ও বিপর্যয় কেবল রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিলো এবং তা ছিলো আংশিক পর্যায়ে। এর পরিধি রাজ-পরিবারের আমীর-ওমরা ও পারিষদবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তারা নিজেদের অন্যায় কাজ সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের মূলনীতিকে মেনে চলতো এবং জনগণের ছোট-বড়ো যাবতীয় ব্যাপারে ইসলামী আইন মোতাবেক ফয়সালা করতো। অবশ্য কোন রাজনৈতিক অথবা আর্থিক স্বার্থ যদি তাদের কোন নিকটাত্মীয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হতো তাহলে সেক্ষেত্রে তারা কখনো অপকৌশলের আশ্রয় নিতো।

রাজা-বাদশা ও আমীর-ওমরাগণ যা করতো তা নিশ্চয়ই বিকৃতি ছিলো, কিন্তু তা ছিলো সীমিত বিকৃতি। তা রাজধানী থেকে বের হয়ে অবশিষ্ট ইসলামী সমাজে ছাড়াতে পারেনি। এই বিকৃতির দ্বারা মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন সাধারণত প্রভাবিত হতে পারেনি। মুসলমানগণ ইসলামী শিক্ষার ছায়াতলেই জীবন যাপন করতো, তদনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম আঞ্জাম দিতো এবং কার্যতও দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য চেষ্টিত ছিলো। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য যে সম্মান ও মর্যাদা নির্দিষ্ট করেছেন সে সম্পর্কে তারা পূর্ণ সচেতন ছিলো। ঈমানের প্রভাবে মুমিন ব্যক্তির জীবনধারা যে উচ্চ ও উন্নত হতে পারে এ অনুভূতি তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। ঈমানকে গ্রহণ করার ফলে তাদের উপর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়েছিলো তার অনুভূতিও তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সাহায্য সহযোগিতার প্রতিও তারা খেয়াল রাখতো। একটি একক আদর্শিক উম্মাত হওয়ার ধারণাও তাদের মধ্যে বিরাজিত ছিলো। কোন মুসলমান যদি দুনিয়ার অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যেতো তবে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও দুই রাষ্ট্রের দুই মুসলমান পরস্পর ভাই হয়ে যেতো এবং নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতো, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মতো পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে মোটেই পশ্চাৎপদ হতো না।

তাদের এই অনুভূতিও ছিলো যে, ধন-দৌলতের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা এবং সব লোককে তাতে অংশীদার করা হয়েছে। কোন

সম্পদশালী ব্যক্তির পক্ষে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা যেমন জায়েয নয়, গরীবদেরকে যাকাত থেকে বঞ্চিত করাও তেমনি জায়েয নয়। তারা জানতো যে, তাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছা অনুযায়ী হওয়া উচিৎ, এজন্য যতো পরিশ্রমই প্রয়োজন হোক না কেন। এটা বাস্তবিকই এক মহান চেষ্টা। তারা এও জানতো যে, জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রের জন্য আল্লাহ্র দেয়া আইন-বিধান হচ্ছে চিরস্থায়ী। তাদের জীবনের যাবতীয় বিষয়কে সুদৃঢ় করার জন্য এবং মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে সুসংগঠিত করার জন্য আল্লাহ্র দেয়া সংবিধান ছাড়া অন্য কোন সংবিধান নেই। তারা এও জানতো যে, প্রকৃত বিজয় ও শক্তি অর্জন করার এবং মানবতাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য ইল্‌ম, আমল ও কঠোর পরিশ্রম একান্ত প্রয়োজন। মূলত মুসলমানদের এই চেতনা ও অনুভূতিই জীবনের সার্বিক দিকে তাদেরকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়ার কারণ ছিলো, যা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

আব্বাসী যুগ

অতঃপর যখন আব্বাসী যুগের গোড়াপত্তন হয় তখন রাষ্ট্রীয় পলিসি ও কাঠামো নির্ধারণে ইরানীদের তৎপরতার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ইসলামী চিন্তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আজগুবী ধ্যান-ধারণা শামিল হতে থাকে। এর মধ্যে সূফীবাদ ও ইল্‌মকে আমল থেকে পৃথক রাখার দর্শন অন্যতম। ইসলামের বাস্তব দৃষ্টিভংগীর সাথে এর কোন মিল ছিলো না। অনুরূপভাবে রাজধানীতে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা, আমীর-ওমরা ও পারিষদবর্গের অন্দর মহলে বাঁদী, কাহিনীকার ও ভাঁড়দের আধিক্য এবং এসব জিনিস নিয়ে অযথা গৌরব-অহংকার ও প্রদর্শনীর কারণে তাদের অন্দর মহলে হাসি-তামাসা, অশ্লীলতা, অলসতা ও পরিশ্রম বিমুখতার এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, যার সাথে ইসলাম কখনো পরিচিত ছিলো না এবং যেগুলোকে সে কোন মূল্যেই বরদাশত করতে পারে না। অতঃপর কবি-সাহিত্যকগণ পেটের খোরাকের বিনিময়ে এই পুতিগন্ধময় পরিবেশকে সাহিত্যের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেয় এবং সাহিত্য কলাও ইসলামের প্রকৃত কলা (Art) থেকে বহু দূরে সরে যায়। সাহিত্যিকগণ এই কলাকে রাজন্যবর্গের সান্নিধ্য লাভের এবং তাদের চিত্ত বিনোদনের উপায়ে পরিণত করে। এসব সাহিত্যিকের সৃষ্টি জীবনবোধ থেকে প্রায় শূন্য ছিলো।

নিঃসন্দেহে এই নৈতিক অধঃপতনের কিছুটা প্রভাব অবশিষ্ট মুসলিম সমাজের উপরও পড়েছিলো। কিন্তু আমরা যদি সেই সময়কার গোটা মুসলিম সমাজ সম্পর্কে এই ধারণা করি যে, তাও রাজধানী শহরের নৈতিক অধঃপতন ও দুষ্কর্মের রং-এ রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিলো এবং সমস্ত লোক খলীফা, আমীর-ওমরা ও রাজন্যবর্গের মতো ভোগবিলাসের জীবনধারা গ্রহণ করে নিয়েছিলো, তাহলে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে।

যদিও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ, বিশেষ করে পাশ্চাত্য লেখকদের বই-পুস্তক এই যুগের বিকৃত চেহারাটাই তুলে ধরার জন্য অধিক চেষ্টা করেছে, কিন্তু যে ব্যক্তিই তার পূর্ববর্তী সময়ের ইসলামী সমাজ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে যে, এই যুগে ইসলামী বিশ্বে রাজধানীর জীবনধারায় কি পরিবর্তন এসেছিলো এবং গ্রাম্য লোকদের জীবনযাত্রা কি ধরনের ছিলো, তাহলে সে অতি সহজেই এই দু'টি শ্রেণীর জীবনযাত্রার মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্যগুলো খুব সহজেই অনুভব করতে পারবে। সে জানতে পারবে, অবশিষ্ট ইসলামী সমাজের তুলনায় রাজধানীর নৈতিক অবক্ষয় ও পথভ্রষ্টতার কোন গুরুত্বই ছিলো না।

আমরা এখানে ইতিহাসের ভংগীতে মুসলমান রাজা-বাদশা ও খলীফাদের ইতিহাস বর্ণনা করছি না, বরং আমাদের দৃষ্টির সামনে রয়েছে গোটা ইসলামী সমাজ। আমরা এ সমাজে সর্বসাধারণের ইতিহাস সামনে রেখেছি, যাদের দ্বারা একটি জাতি অস্তিত্ব লাভ করে এবং যারা নিজেদের সেই চিন্তা-চেতনা ও আকীদার প্রকৃত ছবি পেশ করে, যার উপর তারা ঈমান এনেছে। আমরা বলেছি যে, রাজধানীতে প্রাদুর্ভূত নৈতিক অবক্ষয়ের চাপ সমাজের উপরও অবশ্যই পড়েছিলো, কিন্তু রাজধানীর তুলনায় তা ছিলো খুবই নগণ্য।

কেননা একদিকে যদিও রাজধানীর প্রাসাদসমূহ শরাব, বাঁদী ও গানবাজনার সুরমূর্ছনায় ডুবে থাকাটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং এই গর্হিত কাজে ধন-সম্পদ ও মানবিক শ্রমের যথেষ্ট অপচয় হচ্ছিল, কিন্তু অপরদিকে এই রাজধানীতেই এমন অনেক যোগ্য আলেম ছিলেন যারা সর্বপ্রকারের কোলাহল থেকে দূরে থেকে এবং রাজপ্রাসাদের কৃত্রিম শান-শওকত থেকে মুক্ত থেকে জ্ঞানচর্চার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তারা পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাকেন্দ্রে হাযির হয়ে দীনের জ্ঞানানুশীলনে মশগুল থাকতেন। ফিক্‌হবিদগণ ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিয়োজিত থেকে ইসলামের প্রাণশক্তিকেই

উজ্জীবিত করে রাখতেন। ভূগোলবেত্তাগণ পরিভ্রমণে বের হয়ে আল্লাহ্‌র এই প্রশস্ত দুনিয়া সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য উদঘাটনের মাধ্যমে ভূগোলের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন। তাছাড়া আল্লাহ্‌র দীনের সৈনিকগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য দূর-দূরান্ত অতিক্রম করে একদিকে চীন ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যান। মুহাজিদগণ সর্বত্র ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। উপরন্তু মুসলিম সমাজের শহর-গ্রাম-বন্দর সর্বত্র বসবাসকারী সাধারণ মুসলমানগণ ইসলামের প্রাণসত্তা অনুযায়ী জীবন যাপন করতো। তারা ইসলামকে নিজেদের জীবনে পূর্ণাংগরূপে বাস্তবায়ন করে রেখেছিলো। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে নিয়ে হারাম থেকে বেঁচে থাকতো এবং হালাল গ্রহণ করতো। তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল সমস্ত প্রচলিত সামাজিক প্রথার পূর্ণরূপে হেফাজত করতো।

এর অর্থ কখনও এই নয় যে, এই সমাজ একটি অতুলনীয় ও যে কোন দিক থেকে পূর্ণাংগ সমাজ ছিলো। বরং এর অর্থ এই যে, এই সমাজে ভালো মন্দের উপর, উন্নতির উপায়সমূহ অবনতির উপায়ের উপর এবং উত্তম প্রচলিত প্রথা মন্দ ও হীন প্রথার উপর বিজয়ী ছিলো। আব্বাসী যুগের এই সমাজ উমাইয়্যা যুগের সমাজের তুলায় সামগ্রিকভাবে সাধারণ পর্যায়ভুক্ত ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ইসলামী সমাজই ছিলো। তা কোন কোন দিক থেকে বিচ্যুতি ও বিকৃতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের দাবি ও তাৎপর্য অনুযায়ী জীবন যাপন করতো।

উছমানী যুগ

এরপর তুরস্কের উছমানী যুগ শুরু হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সামগ্রিক ব্যাবস্থাপনা তুর্কীদের হাতে চলে যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তুর্কীরা সামরিক বিজয়ের দিক থেকে ইসলামকে অতীব উন্নতির স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এটাও বাস্তব সত্য যে, তুর্কীদের হাতে ইসলামের অনেক চিন্তাধারা বিকৃত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, তাদের যুগে ইসলামের উপর স্থবিরতা চেপে বসে এবং তার ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

ইসলামের আবির্ভাবের সূচনা থেকে তার সর্বাধিক প্রতীয়মান বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, তা একটি গতিশীল শক্তি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতিশীল ও কর্মতৎপর শক্তি। তা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভ করার ব্যাপারই হোক অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে সফলতা অর্জনের ব্যাপারে হোক, ইল্‌মে ফিক্‌হের

ময়দানই হোক অথবা অর্থনীতি, সমাজনীতির ব্যাপারই হেক, মোটকথা জীবনের কোন দিকই ইসলামের বন্ধনের বাইরে নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যখন তুর্কীদের হাতে চলে গেলো তখন তাদের যুদ্ধ কৌশল ও অসাধারণ সামরিক শক্তির কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা সার্বিকভাবে জয়যুক্ত হয়, কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট ক্ষেত্রে অসহনীয় স্থবিরতার সূচনা হয়ে যায়।

তাদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বের অনুভূতিও খুব বেশী একটা ছিলো না। এর ফলে এই যুগে যখন ইউরোপ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে পরিতৃপ্ত হয়ে নিজেদের রেনেসাঁর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলো, ঠিক এই সময় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেলো।

তুর্কীরা ফিক্‌হের ক্ষেত্রেও ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী ছিলো না। অতএব তারা নিজেদের পরহেজগারীর দাবিতে যা কিছু করেছে তা কেবল এতটুকু ছিলো যে, তারা পূর্ব থেকে মওজুদ ইসলামী জ্ঞানের উত্তরাধিকার থেকে উপকৃত হতে থাকলো এবং এই ভাণ্ডারকে যেই অবস্থায় ছিলো সেই অবস্থায় রেখে দিলো। তারা এর আর কোন পরিবৃদ্ধি ঘটাতে পারলো না। অথচ সমাজ যে ইসলামী চিন্তার আলোকে ক্রমাগত উন্নতির পথে ধাবমান রয়েছে, ফিক্‌হ তো তারই নিদর্শন। এ কারণেই এই ভয়ংকর ও অপছন্দনীয় যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের স্থবিরতার সাথে সাথে সামাজিক অগ্রগতিও রুদ্ধ হয়ে যায়। এটা এতো বড়ো একটা ক্ষতি ছিলো যে, ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোন নজির নেই।

এ যুগেও সমাজ তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রীতিনীতির হেফাজত অবশ্যই করেছে, কিন্তু এই রীতিনীতি নিজের প্রাণসত্তাকে হারিয়ে ফেলেছিলো এবং তা শুধু নিষ্প্রাণ প্রদর্শনীর আকারে থেকে গিয়েছিলো। তা স্বস্থানে অবশ্যই পবিত্র ছিলো, কিন্তু নিজের আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে অপারগ হয়ে গিয়েছিলো। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে তুর্কীদের পর্দা প্রথার ধরন ও বৈশিষ্ট্য। এই প্রথাকে প্রকাশ্যত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি অন্যতম পবিত্র প্রথা খেয়াল করা হতো। কিন্তু উছমানী রাজত্বের শেষ যুগে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এই পর্দা প্রথার এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে যে কোন ধরনের পাপাচারের বাজার সরগরম ছিলো।

মূলত এটা ছিলো সেই অসহনীয় যুগ যেখান থেকে ইসলামের জন্য প্রকৃত বিপদের সূচনা হয়। কেননা কোন চিন্তাধারা অথবা ব্যবস্থার প্রতিপালন ও

ক্রমবিকাশ রুদ্ধ ও স্থবির হয়ে যাওয়ার চেয়ে তার জন্য আর কোন বড়ো বিপদ কিছুই হতে পারে না। কোন সমাজের উপর যখন স্থবিরতা চেপে বসে তখন তার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

উম্যাইয়্যা রাজত্ব থেকে তুর্কী রাজত্ব পর্যন্ত এই গোটা যুগে ইসলামকে আভ্যন্তরীণ ও বাইরের বহুবিধ মর্মান্তিক ও দুঃখজনক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন রাজপরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, মোঙ্গল ও তাতারদের আক্রমণ এবং খৃস্টানদের অব্যাহত আক্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু তুর্কীদের আমলে যখন স্থবিরতার যুগ শুরু হলো, তখন ইসলামের উপর আগত বিপদসমূহের মধ্যে এই বিপদটি সর্বাধিক ভয়ংকর প্রমাণিত হলো।

ইসলামের ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকা খৃস্টানরা এই যুগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। এটা ছিলো তাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং তারা ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য ইসলামী দুনিয়ার উপর ভয়ংকর আক্রমণ চালায় এবং চারদিক থেকে এর উপর টুটে পড়ে। কিন্তু এতসব বিপদ-মুসীবত সত্ত্বেও, যা আভ্যন্তরীণ ও বাইরের দিক থেকে ইসলামকে সহ্য করতে হয়েছে, তারপরও কি ইসলাম খতম হয়ে গেছে ? কখনও নয়।

কেননা ইসলামী বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার জন্য খৃস্টানদের পূর্ণ একটি শতক সময় লেগেছে এবং এজন্য তারা যে কোন ধরনের শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। অতঃপর ইসলামী দুনিয়াকে খতম করার জন্য এবং সর্বশেষ পরিণতি পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য তারা ইসলামী বিশ্বের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করার পরও আরও একটি পূর্ণ শতক ধরে যে কোন ধরনের ধূর্ততা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও খৃস্টানদের এই সর্বশেষ আক্রমণের পর থেকে ইসলামী বিশ্বে একটি ব্যাপক ও ভয়ংকর বিপ্লব এসেছে এবং এই বিপ্লব ইসলামী ইতিহাস ও জীবনধারার জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর বিকৃতি ও বিচ্যুতি প্রমাণিত হয়েছে।

এই বিকৃতি ও বিচ্যুতির পরও ইসলামী সমাজ যদিও দুর্বল ও স্থবির হয়ে গেছে, কিন্তু পতনোন্মুখ হয়ে যায়নি। কেননা ইসলামী আকীদার মধ্যে জীবন্ত থাকার অসাধারণ শক্তি ও যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। মূলত জীবন্ত থাকার এই

যোগ্যতাশক্তির সাহায্যেই ইসলাম অতীতের সব যুগে অসংখ্য দুঃখ ও বিপদ-মুসীবত সহ্য করে আসছিলো। জীবন্ত থাকার এই শক্তি ও যোগ্যতা উছমানী রাজত্বের অপছন্দনীয় যুগেই আবার জাগ্রত হলো এবং তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই শক্তিই হেজাজে ওহাবী আন্দোলন, সূদানে মাহদী সুদানীর মাহদী আন্দোলন প্রভৃতি নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই আন্দোলনগুলো এতোটা শক্তিশালী ছিলো যে, তা ইসলামকে পুনর্জীবন ও স্বাধীনতা দান করে মানুষের জীবন-পাতায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। কিন্তু খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী দুনিয়াকে সজাগ-সচেতন হওয়ার সুযোগ দেয়নি এবং খুব দ্রুত নিজের পুরাতন শত্রুকে খতম করার জন্য নিজের সমস্ত শয়তানী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে।

এবার সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ কেবল সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলো না, বরং সামরিক শক্তির সাথে সাথে যাবতীয় প্রকারের বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণ, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তারা ইসলামী শিক্ষাকে বিকৃত করে। অতঃপর এই বিকৃত ইসলামকে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তা তাদের মন-মগজে প্রবেশ করনোর চেষ্টা করে। তারা নিজেদের মিশনারী তৎপরতার সাহায্যে মুসলমানদের খৃস্টান বানাতে না পারলেও অন্ততপক্ষে তাদেরকে প্রকৃত এবং আসল ইসলামের প্রতি বিদ্রোহী বানাবার চেষ্টা করে।

খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ যে সময় থেকে ইসলামী দুনিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করে তখন থেকে মুসলিম সমাজের বিচ্যুতি ও বিপর্যয়ের সূচনা হয় এবং এমন এমন অদ্ভুত চিন্তাধারার উন্মেষ হতে থাকে যা ইতিপূর্বে ইসলামের উন্নত অথবা পতনশীল যুগেও দেখা যায়নি। এখন বলা হচ্ছে যে, সমাজ ব্যবস্থার সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক আছে, অর্থনীতির সাথেই বা ধর্মের কি যোগাসূত্র রয়েছে, ব্যক্তি ও সমাজ এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের কি দখল আছে, অনুরূপভাবে প্রচলিত প্রথার ও পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে, বিশেষ করে মহিলাদের পোশাকের সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক আছে! শিল্পকলা, সাংবাদিকতা, রেডিও- টেলিভিশন ও সিনেমা শিল্পের সাথে ধর্মের কি সংযোগ থাকতে পারে!

সংক্ষেপে বলতে গেলে জীবনের সাথে ধর্মের যেন কোন সম্পর্ক নেই। তারা পার্থিব জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার অপচেষ্টা করে।

এখন মুসলিম সমাজে এমন লোকও পাওয়া যায় যারা বলে, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ নামায-রোযা আদায় করতে থাকবে সে মুসলমান বলেই গণ্য হবে এবং ইসলাম বিরোধী মতবাদ থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধার নেয়ার ব্যাপারেও সে ইসলামের পাবন্দ নয়। অথবা নিজের চিন্তাধারা ও রীতিনীতির ভিত্তি কোন ইসলাম বিরোধী ব্যবস্থাকে বানানোর বেলায়ও সে নিজেকে ইসলামের বন্ধনমুক্ত মনে করে। অনুরূপভাবে আজ মুসলিম সমাজের নারীরা নাকি বলছে যে, যতোক্ষণ মানুষের নিয়াত ঠিক আছে, সে মুসলমান গণ্য হবে, কিন্তু মুসলমান হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যুবক-যুবতীর পরস্পরের সাথে মেলামেশা করা বা সম্পর্ক রাখা যাবে না। মুসলমান হওয়ার অর্থ এও নয় যে, নারীরা সর্বাধুনিক ফ্যাশন অনুযায়ী পোশাক পরবে না, চাই সে পোশাকে বুক, কটিদেশ, বাহু, হাঁটুর নিম্নদেশ অনাবৃতই থাকুক না কেন অথবা সমুদ্র সৈকতে শরীরের সামান্যতম অংশ আবৃত করে গোটা দেহ উন্মুক্তই রাখা হোক না কেন। রূপচর্চার যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করে প্রয়োজন বোধে কোন পার্টিতে নৃত্যসংগীত পরিবেশন করতেও তাদের ইসলামের কোন ক্ষতি হয় না।

অধিকন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজে এমন নারী ও পুরুষ পাওয়া যায় যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে নিজেদের ধর্মহীনতা ব্যক্ত করে। তারা বলে, ধর্ম তো সেকেলে মানসিকতা, স্থবিরতা ও পশ্চাৎপদতারই নিদর্শন বহন করে। অতএব এটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই প্রয়োজন। তাহলে জাতি জাগ্রত হয়ে উন্নতি ও প্রগতির পথে পা বাড়াতে সক্ষম হবে।

খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য গত দুই শত বছর ধরে যে অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে, এই ধরনের চিন্তাধারা তারই ফল। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের বিকৃতি ও বিপর্যয়ের এটাই একমাত্র কারণ নয়। এটা ছাড়া আরো একটি প্রভাবশালী কার্যকারণ রয়েছে। তা হচ্ছে জড়বাদের বিশ্বব্যাপী প্লাবন। তা গোটা দুনিয়ায় বিচ্ছিন্নতা ও সন্ত্রাসী তৎপড়তা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং নৈতিক মূল্যবোধকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছে। তা মানুষকে ধর্মবিমুখ করে নিরেট

পশুবাদের দিকে আহবান জানায়। এই পথহারা পৃথিবীতে ইতিপূর্বে এর চেয়ে কোন নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি। উপরন্তু এই নৈতিক অধঃপতনকে বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিক মতবাদের উন্নতির কারণ প্রমাণ করা হয়ে থাকে। উন্নতি, প্রগতি ও ক্রমবিকাশের নামে তার জন্য একটি ব্যাপক দর্শনের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, যাতে এই বাড়াবাড়িকে সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্য বানানো যেতে পারে।

উল্লিখিত দু'টি কার্যকারণের ফলেই ইসলামী জীবনধারায় ব্যাপক বিচ্যুতি ও বিকৃতি এসে যায়। আমরা সামনের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তখন আমরা খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরে যে বিকৃতি সূচিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দান করবো অর্থাৎ স্থানীয় ও আভ্যন্তরীণ কারণসমূহের উপর আলোকপাত করবো।

৪

আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ[১]

মিসরের উপর ফরাসীদের আক্রমণের পর থেকে ইসলামের ইতিহাসের একটি নতুন, কিন্তু নিকৃষ্টতম যুগের সূচনা হয়। যদিও ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময় খৃস্টান বাহিনী ইসলামী বিশ্বের উপর কয়েকবার আক্রমণ চালিয়েছিল, কিন্তু প্রতিবার তাদেরকে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। যদিও কয়েকবার মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি স্থানে কিছু দিনের জন্য তারা অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে জুলুমের প্রতিরোধ এবং শত্রুদের বিতাড়িত করার জন্য যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট, বিপদ- মুসীবত ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

এবারও ফ্রান্স যখন মিসরের উপর আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়, তখন শেষ পর্যন্ত মুসলিম জনসাধারণ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তাদেরকে বিদায় নিতে হলো। কিন্তু এমন কতগুলো জিনিস রয়েছে যার কারণে, পূর্বেকার সব আক্রমণ এবং বর্তমানের এই আক্রমণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং এর কারণ ও ফলাফলও পূর্বেকার আক্রমণসমূহ থেকে ভিন্নতর।

উত্তর কায়রোর 'আমবাবাহ' নামক স্থানে নেপোলিয়ানের হাতে মিসরীয় বাহিনীর পরাজয় কেবল সামরিক পরাজয় ছিলো না, বরং এটা ছিল ইসলামের একটি যুগের পরিসমাপ্তি এবং একটি ক্রিয়াশীল মতবাদের পরাজয়। এ কারণে এই পরাজয় জনগণের মনে গভীর ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। মুসলমানগণ এই পরাজয়ের সর্বাধিক প্রভাব গ্রহণ করেছিল এবং তা তাদেরকে কঠোরভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে রেখে দিয়েছিল। অথচ ইতিহাসের এটাই প্রথম

---

১. এই অধ্যায়ে মিসরের উপর ফরাসীদের আক্রমণ, অতঃপর ফ্রান্স ও পরে বৃটেন কর্তৃক মিসরকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করার ইতিহাস এবং মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে তাদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনাটি মিসরের প্রেক্ষাপটে হলেও হিমালয়ান উপমহাদেশকে বৃটেনের উপনিবেশে পরিণতকরণ এবং এখানকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের সাথে এর হুবহু মিল বরং যোগসূত্র রয়েছে। অতএব বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য আলোচনাটি মোটেই অপ্রাসংগিক হবে না। বরং তারা মিসরীয় মুসলমানদের করুণ চিত্রের মধ্যে নিজেদের করুণ চিত্রই দেখতে পাবেন (অনুবাদক)।

সামরিক পরাজয় ছিলো না, এর পূর্বেও মুসলিম বাহিনীকে খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণের মুখে বিভিন্ন সময় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু এই সব থেকে মুসলমানরা অনুভব করতো যে, এটা সামরিক পরাজয়। আক্রমণকারীদের সংখ্যাধিক্য অথবা তাদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে এই পরাজয় ঘটেছে। মুসলমানদের মনে সব সময় এই চিন্তা ছিল যে, এটা একটা সামান্য দুর্ঘটনা মাত্র, মুসলমানরা আবার তৈরি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং যখন তারা জীবনপণ করে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সফলতা দান করবেন।

সব সময় তাই হয়েছে। মুসলমানরা যখন উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং মুজাহিদরা ইসলামের হেফাজতের জন্য জীবন পণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ্র সাহায্য এসেছিল এবং তারা জয়যুক্ত হয়েছিল।

মুসলমানরা সব সময় নিজেদের উন্নত ও প্রভাবশালী শক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে। এমনকি পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েও তারা ভাবতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরই বিজয় হবে। প্রতিটি সামরিক পরাজয়ের পর বারবার বিজয়ী হওয়ার ভিত্তিতে মুসলমানদের মনে একথা বসে গিয়েছিল এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তারা ঈমানের বদৌলতেই সমুন্নত থাকতে পারে এবং তাদের মর্যাদা ও শৌর্যবীর্যের একমাত্র কারণ এই যে, তারা মুসলমান। তাদের দৃষ্টিতে আক্রমণকারী বাহিনী সংখ্যাশক্তি ও অস্ত্রশক্তিতে বলিয়ান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান না থাকার কারণে পরিত্যক্ত পশুর সমান। এ কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং নিকৃষ্ট, যদিও সাময়িকভাবে অনুকূল পরিবেশ ও সময়ের কারণে তারা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়েছে। মুসলমানরা সব সময় খৃস্টানদের অর্থহীন রসম-রেওয়াজ ও বদ অভ্যাসকে ঘৃণা করতে থাকে। আল- মাকরিযী লিখেছেন, "এই লোকদের মধ্যে পৌরুষত্ব বিদ্যমান নেই। এ কারণে তাদের মধ্যে এমন লোকও পাওয়া যাবে, যে নিজের স্ত্রীকে অর্ধ উলংগ অবস্থায় নিজের সাথে নিয়ে বাজারে যায় এবং রাস্তার মাথায় যখন কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয়ে যায়, তখন স্বামী দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং স্ত্রী নিজ বন্ধুর সাথে আলাপে রত হয়। স্ত্রীর কথা শেষ হলে স্বামী তার হাত বগলদাবা করে পুনরায় চলতে থাকে"।

এই ধরনের ব্যাপারকে সাধারণভাবে মুসলিম সমাজের নৈতিক অধঃপতনের প্রমাণ এবং কলুষতা মনে করা হতো। মুসলমানদের ধারণা মতে এ ধরনের

কার্যকলাপ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তিত্ব ও সম্ভ্রমের কোন ধারণাই বিদ্যমান নেই। মুসলমানরা এই অশ্লীল কাজকে বরদাশত করতেও পারতো না এবং সমাজে তার অস্তিত্বও কল্পনা করতে পারতো না।[২]

মোটকথা মুসলমানদের মনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এবং মুমিনদের জন্য যে মর্যাদা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তার পূর্ণ চেতনা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যখন খৃস্টান বাহিনী বন্যার আকারে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল তখনো সেই মুসীবত ও দুশ্চিন্তার মধ্যে এই মর্যাদাবোধ তাদের হৃদয়ে অটুট ছিল। এ সময়ও তারা বিশ্বাস করতো, আমাদের রসম-রেওয়াজ ও রীতিনীতি ছাড়া আর সবই ময়লা-আবর্জনা, তা কোন অবস্থায়ই গ্রহণ করা যায় না এবং ইসলামের জমীনকে এই আবর্জনা দ্বারা কলুষিত করা জায়েয নয়।'

কিন্তু ফরাসীদের আক্রমণের পর থেকে অবস্থার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটা ঠিক যে, মুসলমানদের অন্তরে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস তখনো মজবুত ছিল, কিন্তু আকীদার সাথে তুর্কীদের রাজত্বকালে স্থবিরতা ও আলস্যের শিকার হয়ে তারা জীবনের সমস্ত গতি ও উষ্ণতাকে হারিয়ে ফেলেছিল, যা পূর্ববর্তী সব যুগে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য বহন করছিল। এখন ধর্ম বলতে কেবলমাত্র কতিপয় বাহ্যিক পবিত্র রসম-রেওয়াজের নাম হয়ে গেলো, যার পিছনে না ছিল কোন মহৎ উদ্দেশ্য, না ছিল জীবনের উষ্ণতা, আর না জীবনে কার্যত এর দ্বারা ফল লাভ করা যাচ্ছিল।

উপরন্তু আমবাবাহ নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে নেপোলিয়ানের হাতে মামলূকদের পরাজয় মুসলমানদের জন্য আভ্যন্তরীণ পরাজয় অর্থাৎ তাদের অন্তরে আকীদা-বিশ্বাসের পরাজয়ের পূর্বাভাস প্রমাণিত হলো। মুসলমানদের মনে নেপোলিয়ানের কামান ধ্বনির ভয় গভীরভাবে বসে গেলো। তারা তার আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধকৌশলে এতোটা প্রভাবিত হলো যে, তার মোকাবিলায় মামলূকদের তরবারি তাদের কাছে অর্থহীন মনে হতে লাগলো।

---

২. কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলিম সমাজের চিন্তা-চেতনায় কতো বড়ো পরিবর্তন এসে গেছে। আজ মুসলমানরা এই আবর্জনাময় কথাবার্তাকে প্রগতি, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং সমাজের উন্নততর মূল্যবোধ মনে করে।

এভাবে শক্তি ও ক্ষমতার তুলনা করার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের মধ্যে পরিবর্তন এলো। এটা যেন তাদের পরাজয় এবং খৃস্টানদের প্রথম বিজয়। কেননা এ সময় তারা যুদ্ধাস্ত্র, সমরকৌশল ও বিজ্ঞানের অপরিসীম শক্তিতে সুসজ্জিত ছিল যা মুসলমানদের কাছে ছিলো না।

কিন্তু এ সময় মুসলমানদের মনে শক্তির তুলনা করার নীতির পরিবর্তন না হওয়া উচিৎ ছিল এবং পরাজয় বরণ করেও আবার নতুন উদ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত হওয়াই উচিৎ ছিল। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এই আঘাত সহ্য করার মতো এবং পুনরায় মোকাবিলার জন্য তৈরি হওয়ার মতো শক্তি তাদের আকীদা-বিশ্বাসে বিদ্যমান ছিলো না। একথা ঠিক ছিল যে, জনসাধারণ ফরাসীদের এই আক্রমণকে পূর্ণ শক্তি ও উদ্যম সহকারে মোকাবিলা করে। আলেমদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কায়রোবাসীরা অসম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেয়।

সাঈদ বন্দরের এক যুবকের অবদান এখানে স্মরণীয়। সে রাতের বেলা একাকী শত্রুশিবিরে সন্তর্পণে ঢুকে পড়তো এবং তাদের বন্দুক লুণ্ঠন করে তা নিয়ে সাঁতার কেটে নদীর এপারে চলে আসতো। শত্রুরা যখন নিজেদের অস্ত্রের স্বল্পতা আঁচ করলো তখন তাদের পাহারাদারগণ সন্দেহজনকভাবে ঘুরাফেরা করা লোকদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলো। তাদের ধারণা ছিল কোন অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিরা অস্ত্র পাচার করছে। কিন্তু তারা এই যুবকের দুঃসাহসিক কাজ লক্ষ্য করে অবাক হলো। রক্ষীরা যখন তাকে ধরার জন্য আক্রমণ করলো, তখন সে প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। এমনকি মোকাবিলা করতে গিয়ে যখন তার বাহু ভেংগে গেলো, তাকে গ্রেপ্তার করে কমাণ্ডারের কাছে হাযির করা হলো, কমাণ্ডার তার মুখে তার বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কথা শুনে তাকে নিজের মুখডাকা পুত্র হওয়ার প্রস্তাব দিলো। কিন্তু যুবক তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললো, আমি একজন কাফেরের পোষ্যপুত্র হতে রাজী নই। অতঃপর অধিনায়ক বললো, ভবিষ্যতে তুমি অস্ত্র হাতে নিবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু সে বললো, দুশমন যতো দিন আমাদের ভূখণ্ডে অবস্থান করবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। অবশেষে তারা তাকে ছেড়ে দিলো এবং নিজেদের অস্ত্রগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করলো।

একথা সত্য যে, এ ধরনের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ত্যাগ ও কোরবানীর দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমবাবার যুদ্ধক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে গেলো এবং এর নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকেনি।

এবার মুসলমানদের মন-মগজে পরাজয়ের অনুভূতি এতোটা চেপে বসলো যে, তারা নিজেদের চোখের সামনে মুসলিম সেনানীদের পশ্চাৎপদ হতে দেখেছে এবং তা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে। এবার মুসলমানদের প্রকৃত পরাজয় কেবল যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং নেপোলিয়ান মিসরে তার সংক্ষিপ্ত সময়ের অবস্থানের মধ্যে আল্লাহ্র দেয়া আইন পরিপন্থী আইনও জারী করলো। তার উৎস ছিল ফরাসী আইন। আর ইসলামী আইনকে কেবল ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) অর্থাৎ বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হলো। মুসলমানদের গোটা ইতিহাসে এটা ছিল প্রথম ঘটনা। অর্থাৎ তাদের উপর থেকে আল্লাহ্র বিধানকে তুলে দিয়ে মানব রচিত বিধান চাপিয়ে দেয়া হলো।

এর আগেও ক্রুসেডাররা কয়েকবার মুসলমানদের এলাকায় অনুপ্রবেশ করেছিল এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্বও কায়েম করছিল। বরং গাযী সালাহুদ্দীন আইউবীর সময়ের পূর্বে তারা ভূমধ্য সাগরের তীরে সিরিয়া এলাকায় ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করার সুযোগও পেয়েছিল। কিন্তু তারা কখনো মুসলমানদের উপর নিজেদের রচিত আইন চাপিয়ে দেয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। শুধু এতোটুকু হয়েছিল যে, কখনো কখনো কোন কোন খৃষ্টান নেতা মুসলমানদের কোন কোন এলাকা দখল করে নিয়েছিল, কিন্তু সেখানে নিজেদের কদম মজবুত করার সুযোগ কোন দিনই পায়নি।

মিসরীয়দের অন্তরে ফরাসীদের আক্রমণে পরাজিত হওয়ার বেদনা তীব্রতর হলো। প্রথমে তারা অস্ত্রশক্তির কাছে বিজিত হয়েছে, অতঃপর ফরাসী বাহিনীর সাথে আগত ব্যক্তিরা নিজেদের সংগে করে পাশ্চাত্যের যে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আসে তাও তাদেরকে বিস্মিত ও হতবাক করে দেয়, অতঃপর নেপোলিয়ান মিসরে যে ছাপাখানা নিয়ে আসেন তার দ্বারাও তারা প্রভাবিত হয়। উপরন্তু নেপোলিয়ান মিসরে যেসব সংগঠন কায়েম করেন তাও তাদেরকে প্রভাবিত করে। মোটকথা, ইতিপূর্বে যেসব জিনিস মুসলমানদের হাতে ছিলো না এবং এখন পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা হয়েছে, তা তাদের স্তম্ভিত করে দেয়।

অনুরূপভাবে এই পরাজয় তাদের প্রকৃত এবং পূর্ণ পরাজয়েরই ভবিষ্যদ্বাণী, যার পরে খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের জন্য মিসরের মাটি সমতল হয়ে যায়। তারা যেভাবে ইচ্ছা মুসলমানদের জীবনধারা ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে বিকৃত করে যেভাবে ইচ্ছা ঢেলে সাজায়। এ কারণে মিসর থেকে ফরাসীদের চলে যাবার পরও বাস্তব অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি এবং কর্মের জগতেও তার প্রভাব খতম হয়নি। এখানে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করার পূর্বে দু'টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা যুক্তিসংগত মনে হয়।

(এক) খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের সব সময় খায়েশ ছিল এবং মুসলিম ঐতিহাসিকগণও এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেছেন যে, মিসরের উপর ফরাসীদের আক্রমণের কারণে মুসলিম রাজ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের যে প্লাবন আসে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা খৃস্টীয় উপাদানসমূহকে পূর্ণরূপে গোপন রাখতে হবে। খৃস্টানদের অশুভ উদ্দেশ্যকে গোপন রাখার জন্য এতোটা বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, এই দাবিও করা হয়েছিল যে, খৃস্টানদের যুদ্ধ কোন ধর্মীয় যুদ্ধ ছিলো না, বরং অর্থনৈতিক সুবিধা ও লালসাকে গোপন রাখার জন্য এই যুদ্ধে ধর্মের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের এই ভিত্তিহীন দাবির সমর্থন এমন কতক মুসলমানও করতো, যারা তাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল এবং চোখ বুঝে নির্দিষ্ট বেতন পাওয়ার বিনিময়ে তাদের সুরে সুর মিলাতো।

(দুই) সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বিতীয় খায়েশটি ছিল এবং এখানেও মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাদের সহায়তা করেছেন যে, যেভাবেই হোক প্রমাণ করতে হবে, মিসরের উপর ফরাসীদের আক্রমণ মিসরীয়দের জন্য কল্যাণের উৎসে পরিণত হয়েছে। এই আক্রমণের কারণে তারা আলস্যের ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং সচেতন হয়ে পুনর্জাগরণ এবং শক্তি ও উন্নতির দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে দেখতে সক্ষম হয় এবং নতুন সভ্যতার উপায়-উপকরণ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই আক্রমণ তাদেরকে চতুর্মুখী কল্যাণ লাভের সুযোগ এনে দেয়।

প্রথম বিষয়টির আমরা কোন জবাব দেবো না। কেননা আমাদের উপর তো মুসলমান হওয়ার অপবাদ রয়েছে। বরং খৃস্টানদের লিখিত বই-পুস্তকই এই দাবির প্রতিউত্তর দিয়েছে। রোম ল্যাণ্ডো (Rom Landow) বর্তমান শতকের একজন বিশিষ্ট খৃস্টান লেখক। তিনি বিশ শতকের নতুন সভ্যতার মধ্য দিয়ে

বেড়ে উঠেছেন। বিশ শতকের চিন্তাধারারই তিনি ধারক ও বাহক। এ সম্পর্কে প্রাচ্যে বলা হয় যে, এই চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তি ধর্মীয় গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ি থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে এবং পাশ্চাত্য আমাদের মতো অথর্ব, স্থূল ও দেউলিয়া হয়ে পড়ে থাকেনি। এই লেখক তার নিজস্ব পুস্তকে লিখেছেন ঃ

"ফরাসী পার্লামেন্টের সদস্য গ্রোসট্রিন এবং রিটযার বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী মসিয়ে পিডো মরক্কোর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে খৃস্টবাদ ও ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধ মনে করতেন। অতএব তারা উভয়ে যখন তাকে মরক্কোতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য রাজী করানোর চেষ্টা করেন তখন তিনি বলেন, এটা ক্রুস এবং নতুন চাঁদের মধ্যকার যুদ্ধ" (The Moroccan Drama, পৃ. ৩১০)।

যেসব লোক পাশ্চাত্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে এবং চোখ বন্ধ করে চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই পাশ্চাত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারা যেন উপরোল্লেখিত বক্তব্যের আলোকে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে যে, এই বিশ শতকেও যে সম্পর্কে তাদেরও বক্তব্য হচ্ছে যে, এটা ধর্মীয় অনাচার ও গোঁড়ামী থেকে মুক্তি লাভের যুগ, ফরাসীরা তাদের বিজিত এলাকাসমূহকে কোন দৃষ্টিতে দেখছে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা কি সত্য কথা বলছে ? তারা কি এখনো একথা বলতে থাকবে যে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে খৃস্টবাদের প্রেতাত্মা কেবল অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ছিল, যখন তারাও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হতে পারেনি?

এতো গেলো ফ্রান্সের কথা। এখন অবশিষ্ট খৃস্টান জগত সম্পর্কে শোনা যাক। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মীথ তার Islam in Modern History গ্রন্থের ১০৯-১১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "কার্লমার্ক্সের কর্মতৎপর হওয়ার ও সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার একক ও প্রকৃত শত্রু, যার সাথে গোটা ইতিহাসে তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে, তা ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ দীন ইসলাম। এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কতো তীব্র ছিল এবং ইসলাম কিভাবে প্রায়ই এক ভয়ংকর বিপদ হয়ে সামনে আসছিল ? ইসলাম যুগপৎভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ও আকীদা-বিশ্বাস উভয় ময়দানেই উপস্থিত ছিল এবং খুবই প্রাণবন্ত ছিল। নিঃসন্দেহে যদি মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তাহলে এসবই সঠিক মনে হবে এবং তদনুযায়ী পূর্বে যেভাবে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছিল, এখনও তা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু

যখন ইসলামের গণ্ডির বাইরের লোকদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাবে, যারা ইসলামের বিস্তৃতিলাভের বিরোধী, তখন বিষয়টি ভিন্নরূপে চিত্রিত হবে।

"মূলত ইসলামের এই বিস্তৃতি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে। খৃস্টবাদই এই নব-উত্থিত শক্তির হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রোম সাম্রাজ্যের সুন্দরতম জায়গিরদারী সুবিধা হাতছাড়া করে। কেননা গোটা রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা সৃষ্টি হয়েছিলো। যদিও সিরিয়া ও মিসরের মতো মুসলিম সেনাবাহিনী তখনো কনোস্টান্টিনোপলের উপর নিজেদের শক্তি সুদৃঢ় করতে পারেনি, তবুও একটি দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে সামরিক চাপ অব্যাহত ছিল। ১৪৫৩ সালে যখন মুসলিম বিজয়ের দ্বিতীয় ঢেউ উত্থিত হলো, তখন কনস্টান্টিনোপলও তাদের আয়ত্বে চলে গেলো। উপরন্তু ১৫২৯ সালে ইউরোপের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ভিয়েনা অবরোধ করা হলো এবং এর উপর সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকলো। পুনরায় ১৬৮৩ খৃস্টাব্দে এই অঞ্চল অবরোধ করা হলো।

"১৯৪৮ সালে চেকোসলোভাকিয়া রাশিয়ার প্রভাব বলয়ে চলে যাওয়াটা বর্তমান যুগের ভীত-সন্ত্রস্ত ইউরোপের জন্য কখনো ততোটা ভীতিকর ছিলো না, যতোটা ভীতিকর ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম শক্তির উত্থান, যা কখনো প্রতিরোধ করা যায়নি, কখনো দুর্বল হয়ে পড়েনি এবং অব্যাহতভাবে বিজয়ের পর বিজয় লাভ করে যাচ্ছিল।

"সমাজতন্ত্রের যে অবস্থা, হুবহু মূল্যবোধ ও চিন্তার জগতে ইসলাম ভীতি এবং তার বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা বহির্বিশ্বে ইসলাম যেভাবে সামনে অগ্রসর হচ্ছে, অনুরূপভাবে আদর্শ ও মতবাদের জগতেও তার আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। নিশ্চয় এই নতুন মতবাদ (সমাজতন্ত্র) খৃস্টবাদের আকীদা-বিশ্বাসের বুনিয়াদী মূলনীতিসমূহকে অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত করে তোলার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অথচ এই মূলনীতিগুলো ইউরোপের জন্য এক শক্তিশালী আকীদার মর্যাদা রাখতো। গোটা ইউরোপ তার চারপাশে নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতির জাল এমন অবস্থায় বয়ন করেছিল যে, তাদের দিকে ইসলাম-ভীতি পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হচ্ছিল এবং খৃস্টান বিশ্বের প্রায় অর্ধেক অংশে তা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইসলামই কেবল একক ও

সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তি, যা খৃস্টবাদের হাত থেকে লাখ লাখ মানুষকে ছিনিয়ে এনে নিজের ছায়াতলে আশ্রয় দিতে সক্ষম হয়েছিল।

"নিশ্চয় এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে যে, পাশ্চাত্যবাসীরা, এমনকি যেসব লোকের এই অনুভূতিই নেই যে, তারা এই ধরনের বিষয়ের মধ্যে বিজড়িত রয়েছে, কখনো দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সংঘাতের প্রভাবের উপর বিজয়ী হতে পারে অথবা ক্রুসেডের যুদ্ধের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে, যার কারণে পুরো দু'টি শতাব্দী নির্মম অত্যাচারে পরিপূর্ণ আদর্শিক যুদ্ধের উদাহরণ হয়ে রয়েছে।"

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতি দেখে নেয়ার পরও কি বলা যেতে পারে যে, যেসব মুসলিম লেখক নির্বোধের মতো চোখ বন্ধ করে পাশ্চাত্যের লেখকদের সমর্থন করে যাচ্ছে, তারা সত্য কথা বলছে ? এই উদ্ধৃতি থেকেই অনুভব করা যায় যে, পাশ্চাত্য ইসলামী দুনিয়াকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখছে এবং সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মাবরণে কি ধরনের তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

যদিও একথা সত্য যে, ইউরোপ তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন কেবল মুসলিম বিশ্বেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সব জায়গা আত্মসাৎ করার জন্য যেখানেই যতোটুকু সম্ভব হয়েছে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের জাল বিস্তার করেছে। কিন্তু আমরা অন্য একটি সত্য সম্পর্কেও অনবহিত থাকতে পারি না যে, ইসলামী বিশ্বের উপর গোটা সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের পেছনে ক্রুসেডের আবেগ প্রবলভাবে কার্যকর ছিল এবং আছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানোর জন্য এই সাম্রাজ্যবাদীদের মন-মগজে কেবল অর্থনৈতিক দিকটিই কার্যকর ছিলো না এবং তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ এই যে, তারা মুসলিম বিশ্বে কেবল অর্থনৈতিক প্রাধান্যই বিস্তার করেনি, বরং ইসলামের মূলনীতিসমূহকে খতম করে মুসলমানদের অন্তর থেকে এর প্রভাবকে মুছে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অথচ ভারতের হিন্দু ধর্ম এবং চীনের বৌদ্ধ ধর্মের সাথে তারা কোন সংঘর্ষ বাঁধায়নি। অথচ এই দু'টি ধর্মের জনশক্তি ছিল মুসলমানদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টির সম্পর্ক রয়েছে কল্পিত 'কল্যাণ ও প্রাচুর্যের' সাথে, যা এই আক্রমণের ফলস্বরূপ মিসরসহ গোটা ইসলামী দুনিয়া লাভ করেছে এবং

যে সম্পর্কে স্বয়ং মুসলমানদের মনে ভীতিহীন গল্প কাহিনী ঘুরপাক খাচ্ছে এবং আধুনিক মুসলিম ঐতিহাসিকগণও তাদের ধোঁকার শিকারে পরিণত হয়েছে।

সত্য কথা এই যে, মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আন্দোলনও সজাগ-সচেতন হয়েছিল, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ ছিল সেই বেদনা, যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মিসরীয়দের মনে যার উদয় হয়েছিল। এই জাগরণের ফায়দাকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের আত্মসাৎমূলক আক্রমণের পাল্লায় কোনক্রমেই ফেলা যায় না। একথা সহজে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য বলবে যে, মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আন্দোলনের উৎস তাদের প্রসূত চিন্তা। কিন্তু আমরা যখন ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত হবো তখন আমাদের জন্য প্রয়োজন হবে তাদের তথাকথিত সৎ সংকল্পও আমাদের দৃষ্টির সামনে রাখা। সত্যিই কি ফরাসী আক্রমণের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মিসরের স্বাতন্ত্র খতম হয়ে যাক এবং সে ফ্রান্সের রং-এ রঞ্জিত হয়ে যাক? এটিই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, বরং যে দেশেই ফ্রান্সের পদধ্বনি ঘটেছে সেখানেই সে এই অপচেষ্টা চালিয়েছে।

এখন এর দ্বিতীয় দিকটি দেখা যাক। মুসলিম মিসরের উপর ফ্রান্সের এই আক্রমণের বাস্তব ফল কি দাঁড়িয়েছিল ? মিসরের এই জাগরণ কি তার স্বাভাবিক মূলনীতি, তার প্রকৃত ভিত্তি, রীতিনীতি ও পবিত্র ধ্যান–ধারণাকে শক্তিশালী করার জন্য ছিল, না ঐসব জিনিসকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এই উদ্দেশ্যে ঐ জাগরণ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, মিসরের বুকে এমন একটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে হবে যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক থাকবে না?

তৃতীয় বিষয়টি এই যে, ঐতিহাসিকগণ এমন ঐতিহাসিক সত্যকেও বিস্মৃত করে দিতে চান যা শুধু ঘটারই সম্ভাবনা ছিলো না, বরং ঘটেই গেছে।

একথা কে দাবি করতে পারে যে, কেবল ফরাসী আগ্রাসনই সেই কল্যাণের একক উপায় ছিল, যার কারণে মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ এসেছে, তাদের মূর্খতা, স্থবিরতা ও পশ্চাৎপদতা দূর হয়েছে এবং তাদের মধ্যে নতুন করে জীবনের উষ্ণতা সৃষ্টি হয়েছে; আর এর ফলস্বরূপই স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করেছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে?

ইসলামের ইতিহাসে এমন অসহনীয় পরিস্থিতি কখনো সৃষ্টি হয়নি যে, মুসলমানরা বিকৃতির শিকার হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটাননি যিনি তাদের দিবাস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুলবেন এবং নতুন জীবন দান করবেন। এই ঐতিহাসিকগণ ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে পুতিগন্ধময় বিকৃতি থেকে পরিচ্ছন্ন করা, যা মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের নামে ছড়িয়ে পড়েছিল? অনুরূপভাবে সূদানের মাহদী আন্দোলন সম্পর্কে তাদের কি ধারণা? অনুরূপভাবে অন্যান্য ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কেই বা তারা কি ধারণা পোষণ করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সমাজে বিরাজমান সামগ্রিক, রাজনৈতিক, চিন্তাগত ও আধ্যাত্মিক জুলুম-নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে ইসলামের পুনর্জাগরণ, যাতে তা পুনরায় কর্মক্ষেত্রে আগমন করে মানবজাতির নেতৃত্ব দান করে নিজের ভূমিকা পালন করতে পারে। এই ঐতিহাসিকরা কি এই ধারণায় নিমজ্জিত রয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীরা যা করে তাই কেবল পুনর্জাগরণ? অবশ্য খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ মুসলমানদের অন্তরে যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, এই দৃষ্টিভংগী তারই সাক্ষ্য বহন করে।

আমরা কোন ঐতিহাসিক সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাই না। বাস্তব সত্য এই যে, মুসলমানরা যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেছে, সেদিন থেকে তাদের মধ্যে পরাজিত মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম খতম হয়ে গেছে বা ইসলামের পতন ঘটেছে। পক্ষান্তরে সত্য ঘটনা এই যে, ইসলামী দুনিয়ার উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদকে পূর্ণ একটি শতাব্দী ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিন্তু তারপরও তারা বিজয়ী হতে পারেনি। কেননা সাম্রাজ্যবাদীদের এই তৎপরতার সাথে সাথে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বারবার ইসলামের পুনর্জীবনের ঢেউ উঠতে থাকে। এটা ইসলামী আকীদার মধ্যে দুর্দমনীয় শক্তি থাকারই প্রমাণ বহন করে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ইসলামকে যেসব সংঘাত ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার মোকাবিলা করে সে প্রমাণ করেছে যে, তার মধ্যে রয়েছে এক অপ্রতিরোধ্য প্রাণশক্তি।

খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ ইসলামকে অন্তর থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য কতো সুচতুরভাবে ও ষড়যন্ত্রমূলক পন্থায় যে অপচেষ্টা চালিয়েছিল, সামনের দিকে

অগ্রসর হয়ে আমরা তার খতিয়ান নেবো। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের এবং খৃস্টান মিশনারীদের বক্তব্য পেশ করবো।

মুহাম্মাদ আলী পাশা যখন তুর্কীদের গর্ভনর হয়ে মিসরে আগমন করেন তখন তার অন্তরে তুর্কীদের থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অভিলাষ লুকিয়ে ছিল। কিন্তু তিনি ফরাসীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না, যা তার সাথে মিসরে নিজের শিকড় মজবুত করছিল। তার এদিকে খেয়াল না দেয়ার কারণ এই ছিল যে, ফ্রান্স তাকে সাহায্য করতো ও পরামর্শ দিতো এবং তার জন্য সামরিক বাহিনী গড়ে তুলছিল। এগুলো এতো বিরাট কাজ ছিল যার জন্য মিসরের আর্থিক সংগতি ও জনশক্তি যথেষ্ট ছিলো না। ফ্রান্স মূলত মিসরের উপকারের নিয়াতে এসব কাজ করেনি, বরং নিজেদের খৃস্টবাদী উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যই করেছিল, যা সামরিক আক্রমণের দ্বারা অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

ফ্রান্স মুহাম্মাদ আলী পাশাকে লালন-পালন করে উছমানী খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য উস্কানি দিতে থাকে। যাতে তারা এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, যা অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বেও অনুসৃত হবে এবং ইসলামী দুনিয়া খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এর ফলে পাশ্চাত্য সহজেই এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এবং ইসলামের ভিত্তিমূলকে ধ্বংস করে মুসলমানদের ধর্মহীন করার জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করতে পারবে। তারা সহজেই নিজ নিজ স্থানে বসে খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের সামনে মাথা নত করবে এবং পাশ্চাত্যও নিজের বিষাক্ত হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগ পেয়ে যাবে।

এখানে এমন একটি ভ্রান্তি রয়েছে যার কারণে মুসলমানরা অধিকাংশ সময় প্রতারিত হয় এবং ইতিহাসের বরাত দিয়ে বলে যে, উছমানী রাজত্বের শেষ পর্যায়টা ভীষণভাবে বিকৃতির শিকার হয়ে পড়েছিল এবং তারা শুধু যুলুম-নির্যাতনের পতাকাবাহী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে অযথা বাড়াবাড়ি, অজ্ঞতা, যুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে এর কোন সংযোগ ছিলো না। একথা যখন সত্য তখন উছমানী রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা একটি কল্যাণকর সেবা হিসাবে গণ্য করা হবে না কেন ?

এ সময় উছমানী রাজতন্ত্র যে অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তা সত্ত্বেও কি মুসলমানদের কাছে এই দাবি করা যেতো যে, তারা যেন এই রাজত্বের সাথে সংযুক্ত থাকে, কেননা তা মুসলিম ঐক্যের প্রতীক ? অথচ এই প্রতীকের কারণে তারা অপদস্ত, পশ্চাৎপদ ও স্থবির হয়ে পড়েছিল এবং সংশোধনের প্রতিটি পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা যদি একথা ধরেও নেই যে, উছমানী তুর্কী রাজত্ব ধ্বংস করার অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদীদের একটি বিরাট অশুভ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল অর্থাৎ গোটা মুসলিম বিশ্বের পারস্পরিক সম্পর্ককে ছিন্ন করে তাকে টুকরা টুকরা করে দেয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য. তবুও কি আমরা শুধু এজন্য রাজতন্ত্রের যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে থাকবো যে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সাম্রাজ্যবাদীদের নাপাক উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার উপায়ে পরিণত হবে?

মূলত এই সেই প্রতারণাপূর্ণ কথা, যার মাধ্যমে মুসলমানরা বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। এই বিভ্রান্তি তাদের মধ্যে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি, বরং এর কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতারণাপূর্ণ কথা, যা তারা মুসলমানদের মন-মগজে সুচতুরভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং তাকে মনের গভীরে প্রোথিত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। আর তা এই যে, হয় রাজতন্ত্রের অপমানকর যুলুম-নির্যাতন বরদাশত করতে হবে অথবা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আন্দোলনের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। অতঃপর যা হবার তাই হবে, তুর্কী রাজত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির আগ্রাসন জালেম রাজতন্ত্র থেকে মুক্তি লাভের বিনিময় মূল্যেই পরিণত হোক না কেন। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার এই বলে মুসলমানদের মনে আরো অধিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে, পাশ্চত্য প্রভাব-প্রতিপত্তির অর্থ হচ্ছে মূলত সংশোধন, পুনর্গঠন, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষা। এসব কিছু মুসলমানদের জন্য কল্যাণ ও প্রাচুর্যের কারণ হবে। উছমানী রাজতন্ত্র এই পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন দ্বিবিধ বিভ্রান্তির সূচনা করে দেয়া হলো।

প্রথমত, এই কথাই ভুল যে, শুধু দু'টি পথই খোলা ছিল। অর্থাৎ হয় রাজতন্ত্রের নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক পন্থায় ইসলামী দুনিয়ার পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়ত, এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, মুসলিম দেশসমূহে অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধনের একমাত্র পথ ছিল খৃষ্টবাদী প্রভাব-প্রতিপত্তির আমদানী।

এ প্রসংগে আমরা ওহাবী আন্দোলন ও মাহদী আন্দোলনের নাম উচ্চারণ করবো। এই আন্দোলন দু'টির প্রভাব গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ তার প্রভাবকে দলিত-মথিত করে দেয়। এই কাজ সমাধা করার জন্য তারা মুহাম্মাদ আলী পাশা ও তার সন্তানদের সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করে। এই দু'টি আন্দোলন ছিল পূর্ণাংগ সংস্কার আন্দোলন। এর মধ্যে ওহাবী আন্দোলননের উদ্দেশ্য ছিল গোটা মুসলিম বিশ্বকে যুলম-নির্যাতন ও অলসতা থেকে মুক্ত করা এবং মুসলমানদেরকে তুর্কীদের গোলামী ও এই গোলামীর পরিণতিতে সৃষ্ট স্থবিরতা ও অসচেনতা থেকে মুক্ত করা।

অনুরূপভাবে মাহদী আন্দোলন পশ্চিমাঞ্চলকে (মিসর ও সুদান) ইংরেজদের গোলামী থেকে এবং অবশিষ্ট মুসলিম জাহানকে তুর্কীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। দু'টি আন্দোলনেরই উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানগণ যাতে ইসলামী পরিবেশে জীবন যাপন করতে পারে এবং নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। এর ফলে ইসলামী দুনিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম জাহানের বিপর্যয় সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে না।

এ কারণে খৃস্টান ইউরোপ এই দু'টি আন্দোলনের বিরুদ্ধে উছমানী রাজত্বের উচ্চ পদস্থ অফিসারদের উত্তেজিত করার ব্যাপারে ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করে এবং মুহাম্মাদ আলী পাশা ও তার সন্তানদের এই আন্দোলনের শত্রু বানিয়ে তাকে নির্মূল করার কাজে লাগিয়ে দেয়। সাথে সাথে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ইসলামের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ।

এ দিকটি নিয়ে চিন্তা করার সময় মুসলমানদের দৃষ্টিভংগী পাশ্চাত্যের থেকে ভিন্নতর হওয়া উচিৎ যে, আসল ব্যাপার কেবল যুলুম-নির্যাতন অবশিষ্ট রাখা বা শেষ করা দেয়া নয়; বরং আমাদের সম্যসার সমাধান এই ছিল যে, ইসলামী বিশ্বের ঐক্য এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের শক্তিকে অক্ষুন্ন রেখেই অত্যাচার-নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ এই সমাধানকে পূর্বেও প্রত্যাখ্যান করছে এবং এখনও প্রত্যাখ্যান করছে।

মিসর, সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী প্রভাব এতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসব দেশে এমন এক চিন্তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে যার মাধ্যমে এমন লোকদের

লালন-পালন করা হয়ে থাকে যারা ফ্রান্সকে নিজেদের দ্বিতীয় জন্মভূমি এবং অনুগ্রহের উৎস মনে করে। তারা এ পর্যন্ত বলতে থাকে যে, মিসর তো কখনো প্রাচ্যের অংশই ছিলো না, বরং সব সময় ভূমধ্যসাগরের অংশ ছিল এবং মিসরের চিন্তাগত, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল প্রাচ্যের পরিবর্তে ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহের সাথে। ইসলামের সাথে যেন মিসরের কোন সম্পর্কই ছিলো না। (কেননা ইসলাম তো ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমির পরিবর্তে আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগ থেকে এসেছে)। অতঃপর খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের প্রচেষ্টায় এই চিন্তাধারার লোকেরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে আসীন হয়ে যায়, যেন তারা নব্য বংশধরদের গতিধারাও ফ্রান্সের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে অথবা অন্ততপক্ষে ইসলামের সাথে অপরিচিত করে দিতে পারে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফ্রান্স তার সব স্বপ্নই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি, যার জন্য সে নেপোলিয়ানের যুগে মিসর দখল করেছিল এবং পরবর্তী কালেও তা বাস্তবায়নের আশায় উঠেপড়ে লেগেছিল। কেননা বৃটেনের লোভ-লালসা ও আশা-আকাঙ্খা ফরাসীদের তুলনায় অধিক প্রবল প্রমাণিত হয়েছে। অতএব ১৮৮২ সালে মিসর বৃটেনের গোলামীর অধীনে চলে যায় এবং সত্তর বছরেরও অধিক কাল তার গোলাম থাকে।

এই যুগেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় মিসরে খৃস্টবাদী কার্যকলাপ ব্যাপক আকারে শুরু হয় এবং এ যুগেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ সিরিয়া, লেবানন, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কোতে নিজের খৃস্টবাদী সংকল্পকে পূর্ণতায় পৌছানোর জন্য কর্মতৎপর ছিল এবং এই যুগের শেষ পর্যায়ে অবশিষ্ট মুসলিম দেশসমূহের উপর পর্তুগাল, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও ইটালীর খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীরা ছেয়ে যায়। এই যুগে মুসলমানদের মন থেকে ইসলামের নাম-গন্ধ মিটিয়ে দেয়ার জন্য অনেক সুসংগঠিত ও কৌশলপূর্ণ পলিসি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইসলামকে ধ্বংস করা সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য কোন সহজ কাজ ছিলো না। কেননা ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস মুসলমানদের হৃদয়ের এতোটা গভীরে প্রোথিত ছিল যে, তা শেষ করে দেয়ার জন্য অথবা তার বন্ধন দুর্বল করার জন্য তাদের একান্ত চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন ছিল। সত্য কথা এই যে, খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কঠোর চেষ্টা চালায় এবং শেষ পর্যন্ত আংশিক সফল হয়।

এই উদ্দেশ্য সাধনে সাম্রাজ্যবাদীরা তখনই সফল হয় যখন তারা নিজেদের বিষাক্ত পলিসির অধীনে এমন কয়েকটি বংশধর তৈরি করতে সক্ষম হয়, যারা ইসলাম সম্পর্কে তার নাম ছাড়া আর কিছুই জানতো না। তাদের মন-মগজে একথা বসিয়ে দেয়া হয় যে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার সম্পর্কের নাম। মানুষের কর্মময় জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। অথবা ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা এই ছিল যে, ইসলাম স্থবিরতা, দেউলিয়াত্ব ও পশ্চাৎপদতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং জীবনপথে অগ্রসর হতে হলে ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত

এখন আমরা সাম্রাজ্যবাদী নেতা ও মিশনারীদের বক্তব্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পেশ করবো, যার আলোচনা আমরা শুরু করেছিলাম।

১৮৮২ সালে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মি. গ্লাডষ্টোন সংসদ ভবনে কুরআন মজীদ হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন এবং সদস্যদের সম্বোধন করে বললেন, "এই কিতাব যতো দিন মিসরের কাছে বিদ্যমান থাকবে, আমরা তাদের এলাকায় নির্বিঘ্নে শাসনকার্য চালাতে পারবো না।" এই মন্তব্য এতোটা পরিষ্কার যে, তা ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। মনে হয় এই ব্যক্তি ভালো করে জানতেন যে, মিসরীয় জনসাধারণের শক্তির উৎস হচ্ছে কুরআন অর্থাৎ ইসলাম। আর এই সেই পাহাড় যার সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের টক্কর দিতে হচ্ছে এবং যা একটা বিপদ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এজন্য এই পাহাড়কে টুকরা টুকরা করে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন। এরপরই ডানলপকে মিসরের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য পাঠানো হয়।

খৃস্টান মিশনারীদের শিক্ষাব্যবস্থা

আশ্চর্যের ব্যাপার যে, একটি মুসলিম রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো একজন পাদ্রী গড়ে তোলেন। তা এজন্য করা হয়েছে যাতে এই ব্যক্তি মুসলমানদের হাত থেকে কুরআনকে ছিনিয়ে নিতে পারেন এবং দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের কদম মজবুত হতে পারে। সুতরাং ডানলপ তদনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং তার উদ্দিষ্ট ফল ধীরে ধীরে সময়ের পরিক্রমায় শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে। বৃটেনের পলিসি মূলত সব জায়গায় এরূপ ছিল।

মিসরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু মিসর নয়, গোটা মুসলিম জাহানের ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করতে আসতো। উদ্দেশ্য ছিল এখানে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে তারা ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম হয়ে বের হবে। এই যুগে আল-আযহার ইসলামী জীবন দানকারী শিক্ষার জন্য খুব ভালো একটা স্থান ছিলো না। তুর্কী শাসনামলের শেষ দিকে সমস্ত ইসলামী ব্যাপারগুলো যে স্থবিরতা ও পতনের শিকার হয়েছিল, অনুরূপ অবস্থা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরও হয়েছিল। এখানকার জীবনও প্রভাবশূন্য হয়ে পড়েছিল। এর সাথে সাথে আযহারকে সংশোধন ও সংস্কার করে এবং চরম অজ্ঞতা থেকে বের করে এনে আলোকজ্জ্বল বানানোর জন্য কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু ও তার অনুসারীদের নেতৃত্বে পরিচালিত যে চিন্তা সংগঠনের মাধ্যমে সংস্কার প্রচেষ্টা চালানো হয়, তা সঠিক ছিলো না ভ্রান্ত ছিল এবং এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছিল তা অর্জিত হয়েছিল কিনা সে আলোচনায় না গিয়েও একটি কথা সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ আল-আযাহারকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আদাপানি খেয়ে লেগেছিল। কেননা বাস্তবে সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত পক্ষে মুসলমানদের ধারণায় আল-আযহার ইসলামী আকীদা- বিশ্বাসের আশ্রয় কেন্দ্র ছিল। এটা এমন একটি কেন্দ্র যেদিকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব জায়গার মুসলমানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এরই ভিত্তিতে তা মুসলমানদের দৃষ্টিভংগীতে চিন্তাগত, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের উৎস ছিল এবং ক্রুসেডীয় দৃষ্টিভংগীতে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের স্থিরিকৃত পলিসি অনুযায়ী অগ্রসর হলো। এ ব্যাপারে তারা তাড়াহুড়া করেনি, বরং অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে ধূর্ত চাল চালিয়ে কাজ উদ্ধার করেছে। কেননা তারা দেখেছিল যে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ চলাকালীন আল-আযহারে ঘোড়া বেঁধে যে আহাম্মকি করেছিল তার কারণে জনসাধারণের আবেগ উত্তেজিত হয়ে উঠে। তারা এও দেখেছে যে, খৃস্টান মিশনারীরা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উপর সরাসরি যে আক্রমণ করেছিল তার ফলও ভালো হয়নি। মুসলমানরা বিপদ আঁচ করে ফেললো এবং তারা অধিক পরিমাণে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগলো। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এ ধরনের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কোনক্রমেই দিতে পারে না। তাই তারা সব সময় প্রতারণাপূর্ণ কাজ চালিয়েছে যা অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন. কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক থেকে সফল।

ডানলপ মিসরে সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন এবং তাতে সমাজ বিজ্ঞান ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন সব কেরানী তৈরি কবা হতো যাদেরকে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হতো। এদেরকে টাকার পরিবর্তে স্বর্ণের মাধ্যমে বেতন দেয়া হতো। লোকদের পথভ্রষ্ট করার জন্য এতোটা লোভ দেখানো যথেষ্ট ছিল। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া এই দেখা যায় যে, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কেবল গরীব লোকেরা নিজেদের সন্তানদের পাঠায় যারা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম ছিল। কেননা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিক্ষার দরুন সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষা শিক্ষা করার কারণে প্রতিটি শিক্ষার্থীর চোখের সামনে উন্নত ভবিষ্যতের হাতছানি।

প্রথম দিকে মুসলমানরা নিজেদের আভ্যন্তরীণ ইসলামী অনুভূতির প্রভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি ছিল এসব প্রতিষ্ঠানে না কুরআন পড়ানো হয়, আর না ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা আল-আযহার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা একটি নতুন শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এরা সম্পদশালী পরিবারের সন্তান। দ্বিতীয়ত, তারা সরকারী কর্মচারী হওয়ার কারণে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গণ্য হতে থাকে। উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো গোপনে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতো।

এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা মূলত শিক্ষিত ছিলো না, বরং তারা ছিল কেরানী পর্যায়ের মানসিকতা সম্পন্ন লোক। তারা কেরানীগিরি ছাড়া আর কিছুই করতে পারতো না। তাদের কাজ শুধু এই ছিল যে, ইংরেজ অফিসারদের নির্দেশ সংগ্রহ করে তা যত্ন সহকারে প্রতিপালন করা।

কথা এটা নয় যে, এ যুগে ইংরেজরা সঠিক প্রশিক্ষণের মূলনীতি ও বাস্তব শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে অনবহিত ছিল এবং ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মিসরের স্কুলগুলোর মতো গোলামী মানসিকতা শিক্ষা দিতো। বরং সত্য কথা এই যে, ডানলপ যে পলিসি প্রণয়ন করেছিলেন, শিক্ষিত লোক সৃষ্টি করা তার

উদ্দেশ্যই ছিলো না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল একদল হুকুম-দাস তৈরি করা, যারা শুধু আনুগত্য করবে এবং ইংগিত পাওয়া মাত্র নৃত্য প্রদর্শন করতে থাকবে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যা প্রকাশ করা যেতো না, বরং ধীরে ধীরে নিজের নিশ্চিত লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাচ্ছিল, তা হচ্ছে লোকদের দৃষ্টি আল-আযহার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। তাহলে শেষ পর্যন্ত এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধপতনের শিকার হয়ে এমন অবস্থার সম্মুখীন হবে যে, তার জীবিত থাকার শক্তি আর থাকবে না।

এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা একই পুস্তক একই ভংগীতে পড়াতো। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, ইংরেজরা মোটেই অনবহিত ছিলো না যে, একটি সীমিত পদ্ধতির শিক্ষা শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা ও চিন্তা-শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে তার মধ্য থেকে নতুন চিন্তার যোগ্যতা-শক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কেননা বিভিন্ন জিনিসকে বিভিন্ন পন্থায় এবং নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটে। এভাবে মন-মানসিকতা ও উদ্যম-উৎসাহও পরিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হয় এবং নতুন চিন্তা ও নতুন জিনিসের উদ্ভব ঘটায়।

এই যুগে ইংল্যাণ্ডের স্কুলগুলো সেখানকার ইংরেজ ছাত্রদের যে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল তার ধরন এই ছিল যে, এক একটি বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞান দান করা হতো, যাতে ছাত্রদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটতে পারে এবং তারা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তাছাড়া পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কোন কাল্পনিক জিনিস জিজ্ঞেস করা হতো না, বরং বাস্তব ক্ষেত্রে ছাত্ররা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, সে সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হতো। কিন্তু মিসরে তারা চিন্তা-চেতনার উপর সতর্ক পাহারা বসিয়ে দেয়, যাতে এখানকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৌলিকভাবে চিন্তা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হতে না পারে। মিসরের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইংরেজ অধ্যক্ষগণ এমন প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখতো যেন তারা একটি পূজনীয় দেবতা। তাদের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মনের গভীরে প্রোথিত থাকতো। ফলে শিক্ষার্থীরা এদেরকে অপরিসীম সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হতো এবং এটা প্রশিক্ষণের হাতিয়ার না হয়ে গোলামী মানসিকতা সৃষ্টির হাতিয়ারে পরিণত হয়।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হতো যে, মিসর একটি পশ্চাৎগামী দেশ। কেননা তা কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে কয়লা বা লোহার খনি নেই.। এ কারণে এখানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। অথচ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠলে কোন দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। তাদের আরো ধারণা দেয়া হতো যে, ইউরোপ, বিশেষত গ্রেট বৃটেন একটি উন্নত শিল্প সমৃদ্ধ দেশ। কেননা এখানে লৌহ ও কয়লার খনি মওজুদ রয়েছে।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুরআন মজীদ ও ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে এর বিচ্ছিন্ন অংশ এবং তাও এমন বিকৃতভাবে পড়ানো হতো যে, তা উপকারী হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিকর প্রমাণিত হতো। মিশনারী স্কুলগুলোতে দিনের সূচনা হতো স্কুলের গির্জায় খৃস্টান কায়দায় প্রার্থনার মাধ্যমে। এই প্রার্থনায় মুসলিম ছাত্রদের জোরপূর্বক অংশগ্রহণ করানো হতো। এই ধর্ম তাদের চিন্তা-চেতনায় এমন উপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশে বদ্ধমূল করানো হতো যখন তারা উৎফুল্ল ও উদ্যমশীল থাকতো এবং ভবিষ্যতের নতুন জীবনের রঙ্গীন স্বপ্নে বিভোর থাকতো। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা দেয়া হতো দিনের শেষভাগে যখন শিক্ষার্থীরা সারা দিনের কর্মক্লান্তিতে নুব্জ হয়ে পড়তো এবং তাদের মন স্কুলের বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে রাস্তার উন্মুক্ত পরিবেশ অথবা বাড়ীর আরামদায়ক কামরায় পৌছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তো। উপরন্তু কুরআন মজীদের যেসব অংশ পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল, তা এমন একজন শিক্ষককে দিয়ে পড়ানো হতো, যে বয়সের ভারে নুব্জ হয়ে পড়েছে, উদ্যম-উচ্ছলতা হারিয়ে ফেলেছে এবং জীবনের শেষ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে। সে এক যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সৈনিকের এলোপাতাড়ি চেহারা নিয়ে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হতো। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতায় ধর্মের পরাজিত, প্রভাবশূন্য ও সেকেলে ধারণা ভেসে উঠতো এবং তাদের হৃদয়ে ঘৃণা ও হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হতো।

পরবর্তী কালে ডানলপের শিক্ষানীতিকে আরো সম্প্রসারিত করা হয় এবং কতিপয় মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করা হয়, যাতে খৃস্টবাদী তুফান আরো প্রবল বেগে সামনে অগ্রসর হতে পারে। এগুলো তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভংগী অনুযায় পরিচালিত হয় এবং এখানেও প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান দান করা হতো

না। এসব স্কুলে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যা কিছু পড়ানো হতো তার ধরন ছিল অনেকটা নিম্নরূপ ঃ

১. ইসলাম কেবল একটি প্রতিমা পূজারী জাতির জন্য এসেছিল। তারা যেহেতু মূর্তিপূজা করতো, তাই ইসলাম তাদেরকে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করার আহ্বান জানাতো।

২. এই লোকেরা নিজেদের কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিতো। ইসলাম তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলো।

৩. অতঃপর মূর্তি পূজারীদের মুসলমান বানানোর জন্য ইসলাম যুদ্ধের আহ্বান জানায়। যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং কোন কোন যুদ্ধে ইসলাম বিজয়ী হয়। এই বিজয়ের ফলে ইসলাম, সেই সব এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে যেখানে সে এখনো বর্তমান আছে। সুতরাং ইসলামের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে, তার সামনে এমন কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্তমান নেই এবং তার হাতে এমন কোন পরিকল্পনাও নেই, যা সে এখন মানব সমাজে বাস্তবায়িত করতে পারে।

মনে হচ্ছে এখন যেন দুনিয়ায় শিরক ও মূর্তিপূজা বিদ্যমান নেই, যেখানকার লোকদের আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি ঈমান আনার জন্য ইসলাম আহ্বান জানাতে পারে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে নিজেদের কন্যা জীবন্ত প্রোথিতকারী কোন জাতিও নেই, যাদেরকে ইসলাম এই অমানবিক কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে পারে। তৃতীয়ত, যুদ্ধের প্রসংগটিও বর্তমানের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে শেষ হয়ে গেছে এবং এখন আর জিহাদ করার মতো কোন সুযোগ ইসলামের হাতে নেই। ইসলাম সম্পর্কে তাদের শিক্ষার ধরন ছিল এই। কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তাদের স্কুলে পড়ানো হতো না ঃ

১. ইসলাম একটি বিশ্বব্যাপক শক্তি, যা মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এই জমিনের বুকে পদচারণা করে।

২. ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যা জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণ ও উন্নতির পথ দেখায়।

৩. ইসলাম এই পৃথিবীর কার্যকর শক্তি।

৪. ইসলাম একটি সভ্যতা, যা হাজার বছরেরও অধিক কাল থেকে গোটা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

৫. ইসলাম একটি বিশ্বব্যাপক আন্দোলন, যা গোটা দুনিয়াকে আলো দান করেছে এবং এই আলোর সাহায্য পেয়েই ইউরোপ নিজের নবজাগরণের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

৬. ইসলাম হচ্ছে অর্থনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সুবিচারের নাম।

৭. ইসলাম একটি স্বাধীনতা আন্দোলন, যা ব্যক্তির বিবেক অশ্লীলতা ও গাইরুল্লাহ্‌র গোলামী থেকে মুক্ত করেছে এবং গোটা মানবতাকে সামাজিক ব্যবস্থার ক্রটির কারণে এবং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বৈরাচারের ফলে সৃষ্ট যুলম-অত্যাচার থেকে উদ্ধার করেছে।

৮. ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান, যার ভিত্তিতে জমীনের বুকে আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম হবে, মানুষ কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করবে এবং এই বিধানকেই নিজেদের জীবনে কার্যকর করবে।

খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের উল্লিখিত বিষয়সমূহের কিছুই পড়ানো হতো না। তাতে শুধু এই বলা হতো যে, ইসলাম কয়েকটি ইবাদতের সমষ্টি মাত্র। লোকেরা এগুলো আদায় করলে ধর্মের পক্ষ থেকে অর্পিত তাদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। অথবা ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে চিন্তাগত, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রহসনের সমষ্টি বানিয়ে তাদের সামনে পেশ করা হতো। যাতে একদিকে তা লোকদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও ওজনহীন জিনিসে পরিণত হয় এবং অন্যদিকে প্রকাশ পায় যে, ইসলাম কেবল স্থবিরতা, পশ্চাৎমুখীনতা ও পশ্চাৎপদতার নিদর্শন। এ থেকে দ্রুত মুক্তি লাভ করা এবং ধর্মের গালি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অপরদিকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউরোপ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হতো যে, ইউরোপ হচ্ছে শক্তির উৎস, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, সামাজিক সুবিচার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের কেন্দ্রস্থল। তা এতো উন্নত এলাকা যা প্রতিটি ময়দানেই সব সময় সামনে অগ্রসর হয়ে যাবে। প্রকৃত সামাজিক ব্যবস্থা তাই, যা আজ ইউরোপে প্রচলিত আছে, সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে তাই, যা পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ করে প্রণীত হয়েছে। মানবাধিকারের বৈপ্লবিক মহাসনদ ফ্রান্স রচনা করেছে। গণতন্ত্র হচ্ছে তাই যা ইংরেজ জনসাধারণ

গ্রহণ করে নিয়েছে। রোমের খৃস্টান রাজত্ব সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। এইসব শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মন-মগজে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করা যে, ইউরোপ হচ্ছে অনতিক্রম্য সম্পদের মহাসমুদ্র, যার সামনে ইসলামের মর্যাদা অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। মনে হচ্ছে, যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে এই সমুদ্র-ভাণ্ডারের গোলামী কবুল করতে হবে।

পাদ্রী ডানলপের শিক্ষানীতি কেবল এ পর্যন্ত পৌছেই থেমে যায়নি। আরাবী ভাষা ছিল প্রথম থেকে এবং সব সময় আরব-অনারব সব মুসলমানদের ধারণায় ধর্মীয় কারণে পবিত্র ও সম্মানিত ভাষা। এজন্য তার গুরুত্ব হ্রাস করা খৃস্টানদের জন্য জরুরী ছিল। এর ফলে ধর্মের গুরুত্ব তাদের মন থেকে সহজে দূরীভূত করা সম্ভব হবে। তাই আরবী ভাষার শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বকে যতোদূর সম্ভব অপমানকর পর্যায়ে রাখতে হবে। এজন্য যে স্কুলে ইংরেজী, ভূগোল, ইতিহাস ও অংকের শিক্ষকদের মাসিক বারো আশরাফী বেতন দেয়া হতো, যা সে যুগে স্বাচ্ছন্দের জীবন যাপন করার জন্য যথেষ্ট ছিল, সেই একই স্কুলে তাদের সাথে কর্মরত আরবীর শিক্ষকদের মাসিক চার আশরাফী বেতন দেয়া হতো। এই পলিসির ফলে শিক্ষকদের দু'টি শ্রেণীর অবস্থার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়।

ইংরেজীর শিক্ষক স্কুল ও সমাজে সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়। সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে তার পজিশন উন্নত হয়। সে সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করার সুযোগ পেতো এবং নিজের সন্তানদের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে লালন-পালন করারও সুযোগ পেতো। অপরদিকে আরবীর শিক্ষক জীর্ণ অবস্থা ও হীনমন্যতার শিকার হয়। তার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থারও পতন ঘটে। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে যায় এবং দরিদ্র অভুক্ত অবস্থায় তার সন্তান-সন্ততিরা জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। লোকেরা তাকে যে কোন স্থানে তুচ্ছ-তাচ্ছিলের সাথে দেখতো আর বলা হতো, আহ! বেচারা আরবীর শিক্ষক। এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ধাক্কা মূলত কেবল আরবীর শিক্ষক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সাথে সাথে আরবী ভাষা ও দীন ইসলামের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য পর্যন্ত গিয়ে পৌছে।

এই দুঃখজনক অবস্থার এখানেই শেষ নয়। খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের সাথে সাথে গোটা ইসলামী দুনিয়ায় খৃস্টান মিশনারীরা সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত ব্যাপক

আকারে পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের দাবি ও তার তাৎপর্যকে লোকদের অন্তর থেকে মুছে ফেলার জন্য এবং তদস্থলে খৃষ্টীয়, বিশেষ করে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণাকে অন্তরের মধ্যে বদ্ধমূল করার চেষ্টা চালাতে থাকে। আমাদের সামনে বর্তমানে La Conquete Du Monde Muslaman (ইসলামী বিশ্ব বিজয়) বইটি রয়েছে। এই পুস্তকের তথ্য এবং ইসলামী বিশ্বে সেই সময়কার সাম্রাজ্যবাদী ও মিশনারী তৎপরতা ও তার বিষময় প্রভাব প্রত্যক্ষ করে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, মুসলমানদের সাথে এতো মারাত্মক প্রতারণা করা হয়েছে অথচ এ সম্পর্কে তাদের কোন খবরই নেই। তারা নির্বোধের মতো হাসি হাসতে থাকে অথবা হাততালি দিয়ে নির্বোধের মতো তাওয়াক্কুল করে বসে থাকে। এর চেয়েও দুঃখজন ব্যাপার এই যে, গোটা মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে তাদের পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার যে ফল এবং তার বিষময় প্রভাব আজ মুসলমানদের চিন্তায়, কর্মে, নৈতিকতায় ও আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পাচ্ছে, তা আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। এরপরও আমাদের কোন কোন ভাই এটাকে উন্নতি ও প্রগতি মনে করে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত দেখে খুশিতে ডগমগ, আর অনেকে এটা দেখে শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দায়িত্ব শেষ করে। এই উভয় দল মনে করতো, ইসলামী বিশ্বে শেষ পর্যন্ত এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসবেই এবং এ থেকে বেঁচে থাকা অথবা কোন সময় এর প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। তারা ভুলে যেতো যে, সাম্রাজ্যবাদীরা ও মিশনারীরা গত দুই শতাব্দী যাবত মুসলমানদের মন-মানসিকতা ও বুদ্ধি-বিবেকের সাথে কি সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!

একথা সত্য যে, বিশ্বব্যাপক পরিবর্তনকে আমরা উন্নতি ও প্রগতিই মনে করি অথবা অধঃপতন মনে করি, এটা একটা বিরাট শক্তি। আর এ কথাও সত্য যে, ইসলামী দুনিয়া পর্যন্ত এই পরিবর্তনের ঢেউ আসাটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। কিন্তু এখানে এতোটুকু কথা বলে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন যে, খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী দুনিয়াকে এই বিশ্ববিপ্লবের মাধ্যমে ওলটপালট করে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং এ থেকে বাঁচার কোন সুযোগ তাকে দেয়নি। এই বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সামনে নত হওয়ার পরিবর্তে এর মোকাবিলা করার জন্য কোন উপযুক্ত ও গভীর চিন্তাপ্রসূত ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগও ইসলামী দুনিয়াকে দেয়া হয়নি।

ইসলামের কাছে যদি তার অতীত শক্তি ও নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকতো তাহলে সে নিশ্চিতরূপেই এই বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের মুখে আত্মরক্ষা করতো এবং দুর্বলতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে ভিন্নতর ভূমিকা অবলম্বন করতো। নির্বোধের মতো এই উন্নতি ও প্রগতির জন্য আনন্দিত হতো না এবং পাশ্চাত্য থেকে আগত প্রতিটি জিনিসকে রোগের প্রতিশেধক মনে করে তার দিকে ঝুঁকে পড়তো না। কেননা তা প্রতিশেধক হওয়ার পরিবর্তে স্বয়ং রোগ সৃষ্টির কারণ হতেও পারে। মুসলিম বিশ্ব যদি তার হৃত গৌরবের অধিকারী হতো, তাহলে সে অপমানিত অবস্থায় এর সামনে মাথা নত করার পরিবর্তে গোটা মানবজাতির মুক্তির পথ অবলম্বন করতো। মানবতাকে এই জাহান্নামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতো, যা মুখ হাঁ করে মানবতার দীর্ঘ ইতিহাসের পরিক্রমায় সঞ্চিত পুঁজি গ্রাস করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

আমরা এখানে পূর্বে উল্লিখিত পুস্তক থেকে কয়েকটি উধৃতি পেশ করবো। এই পুস্তক মূলত ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত "মুসলিম বিশ্ব" নামক সাময়িকীর একটি বিশেষ সংখ্যা, যা পঞ্চাশ বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বে প্রোটেস্টান্ট খৃস্টান মিশনারীদের কর্মতৎপরতার উপর আলোকপাত করে রচিত হয়েছিল। এই পুস্তকের প্রতিটি শব্দ চিন্তা করার মতো। এর প্রতিটি বাক্যে সাম্রাজ্যবাদী সংকল্পের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। উল্লিখিত সাময়িকীর তৎকালীন সম্পাদক এ. লি. সাটিলিয়ার (A. Le. Chateller) এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। তিনি এতে ফ্রান্সের ক্যাথোলিক খৃস্টানদের উত্তেজিত করার এবং তাদের সাহস-শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি মিশনারী কাজের ক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্ট মিশনারীদের ব্যাপক তৎপরতার কথা উল্লেখ করে ক্যাথোলিকদের এই কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। উক্ত সাময়িকীতে এই প্রবন্ধের শিরানাম ছিল "মুসলিম বিশ্ব বিজয়"। তৎকালীণ মি. মাসায়েদুল ইয়াফী ও মি. মুহিব্বুদ্দীন খতীব এই প্রবন্ধের আরবী অনুবাদ করে তা "আল-মুয়াইয়েদ" পত্রিকায় ধারাবিহকভাবে প্রকাশ করেন। অতঃপর প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে ১৩৫০ হিজরীতে তারা এটাকে মিসর থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

এই পুস্তকটি যা এতো বছর (৫৬ বছর) পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে, তাতে পুস্তক প্রণয়নেরও এক শত বছর পূর্বেকার মিশনারী তৎপরতার মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯০৬ খৃস্টাব্দে মিসরের কায়রোতে, ১৯১০ সালে ইংল্যাণ্ডের

এডিনবার্গে এবং ১৯১১ সালে ভারতের লাক্ষ্নৌ-এ যে বিরাট মিশনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এই বইয়ে তার রিপোর্ট সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই বই ইসলামী বিশ্বে মিশনারী ঝোঁক-প্রবণতা এবং তাদের উপায়-উপকরণ ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের পূর্ণাংগ মূল্যায়ন পেশ করেছে। একটি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই বইয়ের মূল্য ও মর্যাদা মোটেই ক্ষুন্ন হয়নি, বরং প্রকৃতপক্ষে এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা এই বইয়ের মধ্যে মিশনারী তৎপরতার মৌলিক পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা আজো তাদের কুটিল ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে এবং যার বিষময় ফল আমাদের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে। এই বই পাঠে আরো অনুমতি হয় যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ যা কিছু করছে তার ইতিহাস কতো দীর্ঘ এবং বর্তমান যুগকেও সেই সংঘাতের লীলাভূমিতে পরিণত করে রাখা হয়েছে। এটাকেই ফ্রান্সের মি. পেড়ো এবং এই শ্রেণীর লোকেরা পরিষ্কার ভাষায় ক্রুশ ও হেলালী চাঁদের মধ্যকার যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে এবং অপর ব্যক্তি তা গোপন রাখার চেষ্টা করেছে।

এ. লি. সাটিলিয়ার এই বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, "আমরা ১৯১০ সালে উক্ত (ইসলামী বিশ্ব) সাময়িকীতে ইসলামী রাজনীতি (অর্থাৎ ইসলামী বিশ্বে কি পলিসি গ্রহণ করা যেতে পারে) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলাম, ফ্রান্সের উচিৎ আরবদেশসমূহে কাজ করার যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে তার কাজের ভিত্তি ঃ বুদ্ধিভিত্তিক প্রশিক্ষণের নীতিমালা প্রণয়ন করা। এতে কাজের ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে এবং সুদূর প্রসারী ফল লাভ করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য আমাদেরকে শুধুমাত্র মিশনারীদের পরিচালিত তৎপরতার উপর নির্ভর করলে চলবে না। কেননা আমাদের অসংখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাদ্রীদের সীমিত তৎপরতা যথেষ্ট নয়। এই উদ্দেশ্যে কেবল ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দেয়া শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। কেননা এই শিক্ষা পদ্ধতিতে ইচ্ছাশক্তির উপর ভিত্তিশীল বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়-উপকরণের সাহায্যে কাজ করা হয়েছে। আমি আশা করি এই শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবে কার্যকর হয়ে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাকে ইসলামের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে"।

সাটিলিয়ার এভাবে পরিষ্কার ভাষায় সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের ঘোষণা দিচ্ছেন। তা ছিল এই যে, ইসলামের মধ্যে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা

ব্যবস্থাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অন্য কথায়, খৃস্টবাদী ধ্যাণ-ধারণাকে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাতে হবে। আর এই কাজ কেবলমাত্র মিশনারীদের একার মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। কেননা তাদের তৎপরতা এই ব্যাপক উদ্দেশ্যের তুলনায় অপ্রতুল ও সীমিত। বরং এ কাজ শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে আঞ্জাম দিতে হবে। গোটা মুসলিম বিশ্বে ফরাসী পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে এবং তার মাধ্যমেই খৃস্টবাদী ধ্যান-ধারণা তাদের মন-মগজে প্রবেশ করাতে হবে। কেননা জনগণ মনে করবে এগুলো ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাদ্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, যেখানে ধর্মীয় ভাবধারা পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়।

তিনি ভূমিকায় আরো লিখেছেন, "এ কথা সত্য যে, বৈরূতের খৃস্টান স্কুলের উদ্দেশ্য ও তার শিক্ষাপদ্ধতি ফরাসী কলেজসমূহের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাপদ্ধতি থেকে ভিন্নতর (এগুলো ধর্মহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)। কিন্তু ফরাসী ভাষা, চিন্তাধারা ও শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রাপ্ত ফল প্রায় একই ধরনের। অতএব একথা পরিষ্কার যে, মিশনারী গোষ্ঠী যাদের পেছনে মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এবং যারা অত্যন্ত সুচতুরভাবে নিজেদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তা ইসলামী দুনিয়ায় পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার প্রসারের ক্ষেত্রে গৌরবজনক খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে"।

সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি পাদ্রী যুয়ায়মির-এর[১] বক্তব্য পেশ করছেন, "খৃস্টান মিশনারী ইসলামী বিশ্বে গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক উভয় ধরনের কাজই করেছে। কিন্তু সন্দেহাতীত কথা এই যে, উছমানী রাজত্ব, মিসর অন্যান্য এলাকায় ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক মূলনীতির মধ্যে মিশনারীরা যে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে তা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সৃষ্ট পরিবর্তনের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী"।

পাদ্রী যুয়ায়মির-এর এই বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তিনি পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করছেন যে, ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও মূলনীতির মধ্যে যে পরিমাণ পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে, তাতে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনায় মিশনারীদের তৎপরতারই বেশী হাত রয়েছে।

---

৩. যুয়ায়মির একজন প্রোটেস্টান্ট খৃস্টান পাদ্রী। তিনি গত শতাব্দীর শেষভাগ এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইসলামী বিশ্বে, বিশেষ করে মিসরে কর্মতৎপর ছিলেন। তিনি "ইসলামী বিশ্ব" সাময়িকীর ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদকও ছিলেন।

এ কথাই আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, মূলত বিশ্ববিপ্লব, বিশেষত পাশ্চাত্য জগতে উত্থিত পরিবর্তন ও বিবর্তনের ঢেউ সরাসরি ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক মূল্যবোধকে বিকৃত বা ধ্বংস করতে পারতো না, যদি খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ তার পৃষ্ঠপোষকতা করে তাকে ইসলামের সুদৃঢ় দুর্গে চরম আঘাত হানার জন্য উপযুক্ত না বানাতো। এ এমন এক সত্য যা পাশ্চাত্যের খৃস্টান মিশনারীরা অকপটে স্বীকার করে, কিন্তু অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক ও অন্যান্য লোক তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সাটিলিয়ার তার ভূমিকায় আরো লিখেছেন ঃ

"এ এক বাস্তব সত্য যে, মিশনারীরা প্রোটেস্টান্ট হোক অথবা ক্যাথোলিক, ইসলামী আকীদা সম্পর্কে মুসলমানদের মনকে নড়বড়ে করতে অপারগ হয়েছে। এটা কেবল পাশ্চাত্য ভাষার সাহায্যে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা বিস্তৃত করার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কেননা ইংরেজী, জার্মান, ডাচ ও ফরাসী ভাষার প্রচলন মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে পরিচিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে এবং তা একটি বস্তুবাদী ইসলামের জন্য রাস্তা সমতল করেছে। আর এভাবে মিশনারীরা ইসলামী চিন্তাধারাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা ইসলাম তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই নিজের অস্তিত্ব ও শক্তি-সামর্থ্যের হেফাজত করতে সক্ষম হয়েছে"।

এই বক্তব্য স্বস্থানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, ইসলামী বিশ্বে পাশ্চাত্য ভাষার প্রচলন করার পেছনে খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী চিন্তাধারাকে ধ্বংস করা। অতঃপর এর পরিবর্তে অন্য কিছু গড়ে তোলা অথবা কিছুই না করা। কেননা তাদের মূল উদ্দেশ্য গঠনমূলক ছিলো না, বরং ছিল ধ্বংসাত্মক। স্বয়ং সাটিলিয়ারের মুখ দিয়েই একথা বেরিয়ে আসছে ঃ

"ইসলামী বিশ্বের জনগণ সম্পর্কে আমাদের এরূপ আশা করা উচিৎ নয় যে, ইসলামী চিন্তার ভিত্তিতে নির্মিত কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেলে তারা আবার কোন নতুন কাঠামো নিজেদের জন্য তৈরি করে নিবে। কেননা ইসলামী চিন্তাধারায় যখন দুর্বলতা এসে যাবে এবং এই দুর্বলতার কারণে যে বিচ্যুতি ঘটবে তার স্বাভাবিক দাবি এই হবে যে, তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র বিকৃত হবে এবং ধর্মের প্রাণসত্তা নিজের ভিত থেকে হটে যাবে। এ অবস্থায় নতুন কাঠামো অস্তিত্ব লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই।"

উল্লিখিত বক্তব্য এতোটা পরিষ্কার যে, তা ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। পাশ্চাত্য ভাষা শেখার পেছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তা হচ্ছেঃ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়া। আর খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ একথা ভালো করেই জানতো যে, একবার ইসলামী আকীদার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিতে পারলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে সত্য পথ থেকে বিচ্যুতি। তারা এই উদ্দেশ্যই সফল করতে চায়।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে এবং তার জবাব দানও জরুরী। তা হচ্ছে, পাশ্চাত্যের ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্য যদি ইসলামী আকীদাকে দুর্বল করে দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কি এই ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করবো, অথচ বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমই হচ্ছে এসব ভাষা? না, তা কখনো নয়। কোন ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা নির্বোধ সুলভ কাজ, যা কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক পছন্দ করতে পারে না। সঠিক পন্থা এই যে, আমরা নিজেদের ইচ্ছায় ও অধীনে এসব ভাষা শিখবো, সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে শেখাতে চায় সেভাবে নয়। পাশ্চাত্যের ভাষা আমাদের এমন পন্থায় শিখতে হবে যেভাবে প্রথম যুগের মুসলমানগণ হিব্রু, সুরিয়ানী, গ্রীক, ফারসী ও ভারতীয় ভাষাসমূহ শিখেছিলেন, যা সেই যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার ভাষা ছিল। এসব ভাষা শেখার ফলে তাদের আকীদা-বিশ্বাসে কোনরূপ ত্রুটি সৃষ্টি হতে পারেনি। বরং তারা নিজেদের দীনের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যেই এসব ভাষা শিখেছিলেন। এটা সেই যুগের কথা যখন দুনিয়া মুসলিম পণ্ডিতদেরকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু বলে মান্য করতো। তাঁরা ছিলেন পণ্ডিত হওয়ার সাথে সাথে খাঁটি মুসলমানও।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। মুসলমানরা তাদের বিজিত এলাকাসমূহে যা কিছু করেছে এবং খৃস্টানরা তাদের বিজিত এলাকায় যা কিছু করেছে, শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? একথা সত্য যে, মুসলমানরা নিজেদের বিজিত এলাকাসমূহে নিজেদের সরকারী ভাষার সাধারণ প্রচলন করেছে। বরং তারা ইসলামের প্রসারের জন্যই এসব এলাকা দখল করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের কর্মপন্থা ও মুসলমানদের কর্মপন্থার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলমানরা কখনো গোপনে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তন এবং তাদের মুসলমান বানানোর চেষ্টা করেনি, বরং ইসলামের দাওয়াত ছিল প্রকাশ্য। এর মধ্যে কোনরূপ প্রতারণাও ছিলো না এবং জোর-জবরদস্তিও ছিলো না। স্যার টমাস আরনল্ড একজন বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য খৃস্টান পণ্ডিত। তিনি তাঁর The Preaching of Islam গ্রন্থের ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"আরব খৃস্টান ও আরব মুসলমানদের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তার আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, খৃস্টানদের ইসলাম গ্রহণ করার চূড়ান্ত প্রভাবশালী কার্যকারণ কোন শক্তি প্রয়োগ বা জোর-জবরদস্তি ছিলো না। স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন খৃস্টান গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, যার মধ্যে তিনি খৃষ্টানদের নিরাপত্তা এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং গির্জার প্রাচীন অধিকার ও এখতিয়ারও বহাল রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি এই পুস্তকের ৫১ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "প্রথম হিজরী শতকের বিজয়ী মুসলমানগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ আরব খৃস্টানদের কতোটা ধর্মীয় নিরাপত্তা দিয়েছে এবং তাদের সাথে নিরপেক্ষ ব্যবহার করেছে তার যে উদাহরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তার ভিত্তিতে আমরা এই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, যেসব খৃস্টান গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে তা করেছিল। বর্তমানে যেসব খৃস্টান আরব এলাকায় বসবাস করে তা এই ধর্মীয় স্বাধীনতা ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিচ্ছে"।

বিজিত এলাকাসমূহে আরবী ভাষার প্রচলন ও প্রবর্তন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কেবল পরস্পরের আদান-প্রদানের পথ সমতল করা, যাতে লোকেরা এই নতুন ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। অতঃপর তা যদি তাদের পছন্দ হয় তবে কোনরূপ চাপের মুখে নয়, বরং স্বেচ্ছায় তা কবুল করবে।[৪] আরবী ভাষার

৪. বহু সংখ্যক ইসলামবৈরী পাশ্চাত্য লেখক মুসলমানদের যুদ্ধ বিজয়সমূহকে 'ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে' এরূপ ভ্রান্ত পন্থায় লোকদের সামনে পেশ করে থাকে এবং কতক মুসলমানও তাদের ধোঁকার শিকার হয়ে পড়েছে। অথচ দু'টি কথার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কেননা প্রথম কথা অর্থাৎ মুসলমানগণ সামরিকভাবে বিজয়ী হয়েছে এটা একটা বাস্তব সত্য। কিন্তু ইসলামের প্রচার এবং প্রসার কখনো তরবারির জোরে হয়নি। যেমন আমাদের উধৃত আরনল্ড সাহেবের বক্তব্য থেকেই তা প্রমাণিত

প্রচলনের উদ্দেশ্য কখনো কোন ধর্মের ক্ষতি সাধন করা কিংবা ধ্বংস সাধন ছিল না বা কোন ধর্মের প্রাণসত্তাকে ভিত্তিমূল থেকে এমনভাবে উপড়ে ফেলাও উদ্দেশ্য ছিলো না যে, তা যেন আর কখনো অন্য কোন আকারে প্রস্ফুটিত হতে না পারে। যেমন সাটিলিয়ার খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ ইসলামের ধ্বংস সাধনই ছিল তার উদ্দেশ্য। বরং মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল দীনের সঠিক প্রাণসত্তাকে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম করে তোলা। বিষয়টির ধরন ও প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য উল্লিখিত পার্থক্যই যথেষ্ট।

মি. সাটিলিয়ার তার ভূমিকায় লিখেছেন, "আমরা পুনরায় আমাদের কথায় ফিরে আসি। মিশনারীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পরিণাম ফল সম্পর্কে যতো ভিন্নমতই থাক না কেন, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন হওয়াটা তাদেরই প্রচেষ্টার ফল যা তারা খৃস্টবাদের প্রসারের জন্য করে যাচ্ছিল। উপরন্তু ইসলামী দুনিয়ার রাজনৈতিক বিভক্তিও পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতিরর জন্য রাস্তা সমতল করে দিয়েছিল। কেননা এটা তো বাস্তব সত্য যে, ইসলাম যখন রাজনৈতিক দিকে থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তাকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ষড়যন্ত্রজালে ফেঁসে যেতে আর অধিক বিলম্ব হয়নি"।

উল্লিখিত বক্তব্য দু'টি মারাত্মক বিষয়ের দিকে ইংগিত করছে। প্রথমটি এই যে, যা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, যতো প্রচেষ্টাই চালানো হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল খৃস্টবাদের প্রসার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচেষ্টা চালানো হয়নি যে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে গোটা মানবজাতির উত্তরাধিকার রয়েছে এবং তা জাতিভেদ ও ভৌগোলিক সীমারেখা থেকে মুক্ত। এজন্য তা এতোটা ব্যাপক হওয়া উচিৎ যাতে সমস্ত মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে পারে। যেমন প্রাচ্যের কোন কোন নির্বোধ মুসলমান মনে করে যে, সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী দুনিয়ার উন্নতি ও প্রগতির জন্য যে

হয়। দু'টি কথার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুসলমানরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন দেশ এজন্য দখল করেছে যে, জনগণের স্বেচ্ছার ও শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামকে অনুধাবন এবং নিজেদের মর্জি মাফিক তা গ্রহণ করার পথে সরকার এবং সামরিক বাহিনীর আকারে যেসব বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা ছিল তা যেন দূর হয়ে যায়। কিন্তু বিজয়ের পর মুসলমানরা সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেন যে, তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করে স্বধর্মে অবিচল থাকবে। মূলত পৃথিবীর বুকে ন্যায়ভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা কায়েম করাই ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য, যাতে সমস্ত লোক তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে, চাই তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক।

কাজ করে যাচ্ছে তা মানবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির খেদমতের জন্যই করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদেরও এই ধারণা। অথচ খৃষ্টবাদের প্রসারের জন্য চলছে তাদের সার্বিক প্রচেষ্টা এবং এর সাথে সাথে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে নিঃসার করে দেয়াই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিভক্তি পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য রাস্তা সমতল করে দিয়েছিল। এখানে রাজনৈতিক বিভক্তি দ্বারা সাটিলিয়ার বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইসলামী দুনিয়া অর্ধস্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং এসব রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও অর্ধস্বাধীন অথবা স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। আর এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ তাদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে নিজের শয়তানী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে। মূলত মুসলিম বিশ্বের বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতাই ছিল তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। কেননা এভাবেই ইসলামী দুনিয়াকে জয় করা তাদের জন্য অধিক সহজ ছিল। মুসলিম বিশ্বের অখণ্ডতা তাদের মোটেই কাম্য ছিলো না, তা যতোই দুর্বল হোক না কেন। একথার মধ্যে আমাদের দৃষ্টিভংগীরই সমর্থন পাওয়া যাবে যে, ইসলামী দুনিয়ায় বিপর্যয় ও বিকৃতির প্রসার ঘটানো কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার একার পক্ষে সম্ভব ছিলো না, যদি সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামী আকায়েদের মূলোৎপাটন করার অসংখ্য উপায়-উপকরণের সাহায্যে তার উপর অবিরত আঘাত না হানতো। সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট ও মিশনারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে এসব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেছিল এবং করছে।

যে উদ্দেশ্যে আমরা এই উদ্ধৃতিগুলো পেশ করলাম তা বুঝার জন্য মি. সাটিলিয়ারের ভূমিকায় অনেক তথ্য বিদ্যমান রয়েছে। এই ভূমিকা পাঠ করলে সহজেই জানা যায় যে, গত এক শতাব্দীতে ইসলামকে খতম করার জন্য কি কি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তা থেকে আরো জানা যায়, বর্তমানেও খৃস্টান বিশ্ব ইসলামী বিশ্বের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছে। তবে পার্থক্য এই যে, এখন আর তারা পূর্বের মতো ঘোষণা দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে না, তা করছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে তাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখা হচ্ছে। এমনকি কোন কোন সময় তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারও করা হচ্ছে। এর দু'টি কারণ আছে ঃ

(এক) তাদের প্রতারণাপূর্ণ চাল বাস্তব ক্ষেত্রে নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এর প্রভাব এখনো নিজের কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য তাদের

মুখোশ পরে থাকাই উত্তম। তাহলে তারা ধারাবাহিকভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে এবং এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারবে না, যার ফলে মুসলমানরা সতর্ক হয়ে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্যের আসল রূপ আবিষ্কার করে ফেলতে পারে।

(দুই) খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ মুসলমানদের মধ্যেই নিজেদের এমন সাহায্যকারী পেয়ে গেছে যাদের প্রাণসত্তা সাম্রাজ্যবাদের শিকার এবং যাদের মন-মানসিকতায় সাম্রাজ্যবাদের বিষ মিশ্রিত। এখন তারা ইসলামী আকীদার মূলোচ্ছেদের কাজটি এদের হাতেই অর্পণ করেছে। ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র সে লেখক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, উদারপন্থী ও প্রগতিবাদীদের মধ্যে নিজের সাহায্যকারী পেয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এখন ধ্বংসাত্মক কাজের দায়িত্ব এদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং তারা নিশ্চিন্তে বসে নিজেদের ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দেখে আনন্দিত হচ্ছে এবং মুসলমানদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

সাটিলিয়ারের ভূমিকা থেকে আমরা যেসব উদ্ধৃতি পেশ করেছি তাতে সাম্রাজ্যবাদীদের আসল রূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এরপর মূল বইতে যেহেতু ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের কুটিল ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সেজন্য তার কিছুটা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। এই বইটি নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে বিভক্ত ঃ

১. মিশনারী কর্মসূচীর ইতিহাস

২. ১৯০৬ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত মিশনারী সম্মেলন

৩. ১৯১০ সালে এডিনবার্গে অনুষ্ঠিত মিশনারী সম্মেলন

৪. জার্মানীতে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মেলন

৫. ১৯১১ সালে লাখ্নৌ-এ অনুষ্ঠিত মিশনারী সম্মেলন

৬. মিশনারী প্রতিনিধি দলের বস্তুবাদী সংগঠন

৭. মিশনারীদের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা।

এসব অনুচ্ছেদে আরো অনেক তথ্য বিস্তারিত আকারো বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কেবল তাদের অসৎ উদ্দেশ্য প্রতীয়মানকারী কিছু বক্তব্য এখানে

তুলে ধরবো। বইয়ের ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় কায়রোতে অনুষ্ঠিত ১৯০৬ সালের সম্মেলন শিরোনামের অধীনে বলা হয়েছে ঃ

"যেসব লোক আল-আযহার এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যের পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে, তাদের কথা উল্লেখ করে সম্মেলনে উপস্থিত জনৈক সদস্য ইসলামী দুনিয়ায় আল-আযহারের প্রভাব এবং এর প্রতি মুসলিম যুবকদের আকর্ষণের কথা বর্ণনা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার বছরের ঐতিহ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, যুগের পর যুগ ধরে মুসলমানদের মন-মানসিকতায় একথা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আল-আযহারে আরবী ভাষার শিক্ষা অনেক উন্নত ও শক্তিশালী। আল-আযহারে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা গভীর ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত। এই প্রতিষ্ঠান অবৈতনিক শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কেননা এর ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় থেকে আড়াই শত শিক্ষকের বেতনের ব্যবস্থা করা সম্ভব।"

অতঃপর তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, "আল-আযহার যদি খৃস্টান গির্জার জন্য আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?" তিনি নিজেই এর উত্তরে বলেন, "একটি খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। এর যাবতীয় ব্যয়ভার গির্জা বহন করবে এবং এই প্রতিষ্ঠান খৃস্টানদের সকল উপ-সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। তাহলে সহজেই আল-আযহারের মোকাবিলা করা যাবে এবং এখানে আযহারের চেয়েও উত্তম পন্থায় আরবী ভাষা শেখানো হবে।"

তিনি এভাবে নিজের বক্তব্য শেষ করেছেন ঃ "আল্লাহ আমাদের কাজের কেন্দ্রস্থল হিসাবে মিসরকে বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন। অতএব গোটা ইসলামী দুনিয়াকে খৃস্টান বানানোর জন্য এই স্থানে অতি দ্রুত একটি খৃস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা প্রয়োজন।"

উল্লিখিত বক্তব্য চিন্তা করলে দেখা যায়, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গির্জার জন্য একটি ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ। এজন্য এই প্রতিবন্ধকটিকে রাস্তা থেকে সরানো একান্ত প্রয়োজন। তা কিভাবে সরানো হবে? হাজার বছরের অধিক কালের ঐতিহ্য মণ্ডিত এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাব খতম করার জন্য সম্ভাব্য সকল

উপায়-উপকরণেব সাহায্যে এর একক সুনামকে ক্ষুণ্ন করতে হবে অথবা এর পাশাপাশি এর চেয়েও উন্নত মানের আরেকটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে। তাহলে আল-আযহার আর দশটি প্রতিষ্ঠানের মতো সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসবে।

উল্লিখিত গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "এরপর সম্মেলনে মেডিক্যাল টীম প্রেরণের প্রসংগ উত্থাপিত হয়। মি. হারবার উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, মেডিক্যাল টীমের আকার আরো বর্ধিত করা প্রয়োজন। কেননা এদের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে সহজেই সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এজন্য অন্যান্য মিশনারী সংস্থার তুলনায় তারা ডাক্তারদের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়।"

৩৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "মিশনারী সংস্থার ডাক্তারদের কখনো এবং কোন অবস্থায় একথা ভুললে চলবে না যে, সর্বপ্রথম তারা মিশনারী এবং অতঃপর ডাক্তার।"

উদ্ধৃতিগুলো নকল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকদের সামনে একথা তুলে ধরা যে, খৃস্টান মিশনারী কি কি উপায় ও উপকরণের মাধ্যমে মানবসেবার নামে আল্লাহ্‌র দীনকে নিশ্চিহ্ন করার যড়যন্ত্রে করে যাচ্ছে।

উক্ত পুস্তকের ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "এসব মিশনারীর প্রচেষ্টার প্রথম ফল এই হওয়া উচিৎ যে, মুসলিম যুবক-যুবতীরা যেন খৃস্টান হয়ে যায়। এর দ্বিতীয় ফল এই হওয়া উচিৎ যে, মুসলমানদের সব শ্রেণীর মধ্যে যাতে মিশনারী ধ্যানধারণা গ্রহণ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।"

ইতিপূর্বে এই পুস্তকের ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের কর্মতৎপরতার দুর্বল প্রভাব লক্ষ্য করে মিশনারীদের নিরাশ হওয়া উচিৎ হবে না। কেননা মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাব এবং নারী স্বাধীনতার ঝোঁক-প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। সেই যুগে অর্থাৎ ১৯০৬ সালের দিকে মিশনারীরা মুসলমানদের খৃস্টান বানানোর পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করা এবং তাদের মধ্যে নারী স্বাধীনতার বীজ বপন করার জন্য অধিক চেষ্টা করে।

উল্লিখিত দু'টি উদ্ধৃতিই খৃস্টান পাদ্রী যুয়াইমের-এর। তার সম্পর্কে আমরা বলে এসেছি যে, মিসর ও তার নিকটস্থ দেশসমূহের জন্য সে ছিল অতি ভয়ংকর

ব্যক্তি। উল্লিখিত উদ্ধৃতিদ্বয়ে সে মূলত বলতে চাচ্ছে, মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে খৃস্টান বানানো ততোটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, বরং চিন্তাগত, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দিক থেকে তাদের খৃস্টান বানানো হচ্ছে আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফল হয়েছে।

কায়রোতে অনুষ্ঠিত এই মিশনারী সম্মেলনে ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলনের উপরও আলোকপাত করা হয়। এই আন্দোলনের নেতা স্যার সাইয়েদ আহমাদ খানের নাম উল্লেখ পূর্বক আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী শিক্ষা সংস্থা যে ভূমিকা পালন করে তাও আলোচনা করা হয়। কায়রোর সম্মেলনে 'আধুনিক ইসলাম' শীর্ষক বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করতে গিয়ে পাদ্রী হোয়াইট ক্রুষ্ট বলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদেরকে খৃস্টবাদের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।"

একথা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই অথবা যে সংস্থা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়, সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে লুফে নেয় এবং এ নিয়ে অপ্রচারের মাধ্যমে তাকে আরো ফাঁপিয়ে তোলে। অতএব এই পুস্তকের ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "মুসলমানদেরকে খৃস্টান বানানোর কাজটি স্বয়ং তাদের মধ্যকার এই সংস্কারবাদীদের দ্বারাই করানো উচিৎ। তাহলে তারা নিজেদের হাতেই নিজেদের শিকড় কেটে ফেলতে থাকবে।"

এখানে "আধুনিক ইসলাম" কথাটিও লক্ষণীয়। কেননা আধুনিক ইসলাম বলতে সেই ইসলামকে বুঝানো হয়েছে, যার প্রচার খৃস্টান মিশনারীরা করে বেড়ায়। অর্থাৎ তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামকে যেভাবে বিকৃত করা হয়েছে, এখানে সেই ইসলাম বুঝানো হয়েছে। এই ইসলামই এক শ্রেণীর মুসলমানকে খৃস্টবাদের নিকটবর্তী করে দিয়েছে।

৬০ নম্বর পৃষ্ঠায় এক মিশনারীর বক্তব্য এভাবে নকল করা হয়েছে, "স্কুল হচ্ছে মিশনারীদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার সর্বোত্তম হাতিয়ার।"

৭২ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "স্থানীয় মুসলমানরা যতো দিন খৃস্টান মিশনারী সংস্থাগুলোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ থাকবে ততো দিন তাদের শিক্ষার জন্য ধর্মহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সরকারের কর্তব্য।" (এখানে জার্মান সরকারের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কেননা ঐ সময় আফ্রিকার মুসলিম এলাকা তার দখলে ছিলো)।

একই পুস্তকের ৭২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, উছমানী সরকারের রাজধানীতে সমস্ত বড়ো বড়ো দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতগণ এই কথার উপর ঐক্যমতে পৌঁছলেন যে, পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাচ্য সমস্যার সমাধানে যে ভূমিকা রেখেছে তা ফলাফলের দিক দিয়ে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্জিত সাফল্যের চেয়েও অধিক।"

উল্লিখিত বাক্যে তারা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করছে যে, প্রাচ্য সমস্যার সমাধানে এসব ধর্মহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা পালন করেছে তা পাশ্চাত্য দেশসমূহের সম্মিলিত ভূমিকার চেয়েও অধিক। পাশ্চাত্য দেশগুলো সম্মিলিতভাবে প্রস্তাব পাশ করে ইসলামী দুনিয়াকে নিঃশেষ করার জন্য এবং একে টুকরা টুকরা করে নিজেদের প্রভাব-বলয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

'প্রাচ্য সমস্যা' নামক পরিভাষাটি ইউরোপের গোটা ইতিহাসে উছমানী রাজত্বের শেষের যুগ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান এই ছিল যে, এই উছমানী রাজত্বকে যেভাবেই হোক শেষ করে দিতে হবে। অথচ এটা ইসলামী ঐক্যের সর্বশেষ প্রতীক। অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপ তার ভয়ে সব সময় শংকিত থাকতো এবং একে ইউরোপের 'রুগ্ন দেহ' বলে অভিহিত করতো। কিন্তু এই রুগ্ন দেহটি তাদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল এবং তা সব সময় তাদের স্নায়ুকে অস্থির করে রাখতো।

তারা শেষ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধে নিজেদের গোপন বন্ধু মুস্তফা কামাল পাশার সাহায্যে এই রাজত্বের পতন ঘটায়। কামাল পাশা ইসলামী ঐক্যকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে এবং তদস্থলে তুরস্ক নামক ধর্মহীন দুর্বলতম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করে তাদের অন্তরকে শীতল করে দেয়। এর বিনিময়ে খৃস্টান বিশ্ব তাকে বিরাট বিরাট খেতাবে ভূষিত করে এবং আজ পর্যন্ত সর্বত্র তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করো।[৫]

---

৫. ইসলামী আকীদা ও ঐতিহ্যের কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করে উছমানী রাজত্বের জুলুম-নির্যাতন ও স্বৈরাচারের মূলোৎপাটনের ইসলামী পন্থা কি হতে পারতো-তা আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি। কিন্তু সেই পন্থা উপেক্ষা করে মুস্তফা কামাল পাশা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এই সময়কার ঐতিহাসিক তথ্যসমূহকে যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে পরিষ্কার জানা

লেখক এখানে স্বীকার করেন যে, ধর্মনিরপেক্ষবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাচ্য সমস্যার সমাধান অর্থাৎ ইসলামের মূলোৎপাটনের ক্ষেত্রে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা যুদ্ধ, রাজনীতি এবং সেনাবাহিনীও করতে পারেনি। এই সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে আমরা নিজেদের পুত্র-কন্যাদের গৌরবের সাথে বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠাচ্ছি।

যায় যে, ইসলামী দুনিয়ার অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য উছমানী সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন করার মধ্যে মুস্তফা কামালের উদ্দেশ্য সৎ ছিলো না। বরং তিনি মূলত তার খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন, যারা তার মাধ্যমে ইসলামী ঐক্যের এই সর্বশেষ চিহ্নটুকুও বিলীন করে দেয়। তিনি যে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র ও প্রতাররণার আশ্রয় নিয়ে তাদের এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সহযোগিতা করেন। অন্যথায় কামাল পাশা ইসলামী বিশ্বের সংস্কারের এমন সুযোগ পেয়েছিলেন যা ইতিপূর্বে আর কেউ পায়নি। সার্বিক শক্তি তার হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এর মাধ্যমে তিনি যে কোন নির্দেশ কার্যকর করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই সমস্ত শক্তি ইসলামের মূলেৎপাটনের জন্য ব্যয় করেন, গঠনমূলক কোন কাজ করেননি। আর পর্দার অন্তরালে থেকে খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের পাঁচ শত বছরের পুঞ্জীভূত আক্রোশ চরিতার্থ করে। কেননা তারা সব সময় উছমানী প্রশাসনের ভয়ে শংকিত থাকতো। এর পেছনে ইহূদী ষড়যন্ত্রও কার্যকর ছিল, যাদেরকে মুসলিম ফিলিস্তীনে সামান্য আবাসভূমি দিতেও সুলতান আবদুল হামীদ অস্বীকার করেন। ওয়েলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মীথও তার Islam in Modern History গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই খৃস্টান এবং ইহূদীরা সম্মিলিতভাবে উছমানী রাজতন্ত্রের স্বৈরচারকে অপ্রচারের মাধ্যমে বহু গুণে ফাঁপিয়ে তোলে এবং কামাল পাশাকে অনেক উঁচুতে স্থান দেয়, যাতে তিনি অতি উৎসাহের সাথে ইসলামকে পরাভূত করার কাজ আঞ্জাম দেন। কামাল পাশাকে মহান ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য তারা নিজেদের সম্মিলিত শক্তির ব্যবহার করে। তার বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি আদায় করার জন্য খৃস্টান ও ইহূদী লেখকরা বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য বই-পুস্তক রচনা করে। তাকে মুসলিম জাতির একমাত্র অনুসরণীয় নেতা বানাবার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের কুটিল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইহূদী-খৃস্টানরা মুসলিম ঐক্যের সর্বশেষ চিহ্নটুকুও খতম করে দেয়, যাকে কেন্দ্র করে তারা আবার দুনিয়ার বুকে একটি শক্তিশালী উম্মাত হিসাবে পুনর্গঠিত হতে পারতো এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারতো। তারা তুরস্ককে একটি অতি দুর্বল ও প্রভাবহীন রাষ্ট্রে পরিণত করে। তা সত্ত্বেও ক্যান্টওয়েল স্মীথ তার গ্রন্থে তুর্কী সরকারের শক্তিসামর্থ্য ও ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন এবং মুসলমানদেরকে আহ্বান জানান, তারা সবাই মিলে এই রাষ্ট্রের অনুসরণ করে যেন একটি পরাশক্তিতে পরিণত হয়।

১৯১০ সালে এডিনবার্গে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সম্পর্কে উক্ত পুস্তকের ৬৪ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "এডিনবার্গ সম্মেলনের কার্যবিবরণী কেবল কাগজের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। কেননা এডিনবার্গের মিশনারী সম্মেলনের পর জার্মানীতে অনুষ্ঠিত মিশনারী ও সাম্রাজ্যবাদী সম্মেলনে মিশনারী প্রতিনিধিদল প্রেরণের উপর এতোটা জোর দেয়া হয়েছিল যে, তা রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্মেলন হওয়ার পরিবর্তে ধর্মীয় ও মিশনারী সম্মেলনে পরিণত হয়।"

উক্ত পুস্তকের ৮০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "সুইজারল্যাণ্ডের যে সাময়িকী থেকে আমরা পূর্ববর্তী বক্তব্য নকল করেছি, সেই সাময়িকীতে মিশনারী প্রতিনিধিদল প্রেরণ সম্পর্কে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মেলনের ভূমিকার উপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের গুরুত্ব এই যে, এটা এ. কে. ক্যাসফিল্ডের প্রবন্ধ। তিনি সাম্রাজ্যবাদী সম্মেলনের ইসলাম সম্পর্কিত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বার্লিনের মিশনারী সংস্থারও প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধে লিখেছেন, সাম্রাজ্যবাদী সম্মেলন দু'টি দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার।

(১) এতে শিল্প-কারিগরি ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ আলোচিত হয়।

(২) এই সম্মেলনে এই বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করা হয় যে, জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহকে নৈতিক ও ধর্মীয় তৎপরতার সাথে একাকার করে দিতে হবে।

এই মতের সমর্থনে হামবুর্গের চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি মি. শানকালের বক্তব্য পেশ করা হয়। তিনি বলেন, "দেশের সম্পদ বৃদ্ধি সেই লোকদের গুরুত্ব বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল, যারা এই ঔপনিবেশিক দেশসমূহে যাতায়াত করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সবচেয়ে বড় উপায় এই যে, ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে খৃস্টান ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। আর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যও এটা বুনিয়াদী শর্ত।"

অতঃপর এই সম্মেলনে মিশনারী এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ইসলামের প্রসংগ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। তখন প্রবন্ধকার আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশের জন্য ইসলামের দিক থেকে যে বিপদ রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি সম্মেলনে পরামর্শ পেশ করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির পরিণতি ও

ফলাফলকে কোন দিক থেকে, অর্থাৎ মিশনারী চিন্তাগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

উল্লিখিত বক্তবে সাম্রাজ্যবাদ ও মিশনারীদের মধ্যকার গভীর সম্পর্কের কথা ফুটে উঠেছে। এ বক্তব্য থেকে আরো জানা যায়, সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে ইসলামকে খতম করা একান্ত দরকার, এমনকি নিরেট অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরী। তাদের ধারণা এই যে, ইসলামকে খতম করার মাধ্যমেই কেবল ইসলামী দুনিয়াকে সাম্রাজ্যবাদের কবলে রাখা সম্ভব। একদল নির্বোধ মুসলমান এবং কতিপয় লোক যারা নামেমাত্র মুসলমান, এই কাজে তাদের সাহায্য করে যাচ্ছে।

১৯১১ সালের লাখনৌ সম্মেলন শিরোনামে লেখা হয়েছে, "এখন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে ৩,৭১,২৮,৮০০ এবং মুসলমানদের অধিকাংশের রাজনৈতিক কর্তৃক ইসলামী খেলাফতের হাতছাড়া হয়ে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও হল্যাণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে চলে গেছে। বর্তমানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রতিটির অধীন মুসলমানদের সংখ্যা উছমানী রাজত্বের অধীনে বসবাসকারী মুসলমানদের তুলনায় অধিক। অদূর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য বিপ্লবে খৃষ্টান রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন মুসলমানদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থায় মুসলমানদেরকে খৃষ্টান বানানোর ব্যাপারে খৃষ্টান রাষ্ট্রসমূহের দায়িত্ব আরো বেড়ে যাবে।[৬]

নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ

আমরা পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে নকল করে এসেছি, "মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের কাজের মন্থর গতি দেখে মিশনারীদের নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। কেননা মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ এবং নারী স্বাধীনতার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে গেছে।"

এই পুস্তকের ৮৮ ও ৮৯ পৃষ্ঠায় লাখনৌ ও কায়রোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে দু'টি বাক্য উদ্বৃত করা হলো ঃ "এইসব ঘটনার ভিত্তিতে

৬. ১৯১১ সনে এসব বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এর পরপরই কামাল পাশার বিপ্লব এবং এ ধরনের আরো কয়েকটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এসব বিপ্লবের পিছনে খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র কার্যকর ছিল।

গীর্জার অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, গীর্জা তার পূর্ণ প্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োগ করবে এবং মিশন ও মিশনারীদের কর্মতৎপরতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। এজন্য লাখনৌ সম্মেলনের কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঃ

১. বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন।

২. মিশনারী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান।

৩. প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সরবরাহ করা এবং বর্তমান যোগ্যতার মান উন্নত করা।"

কায়রো সম্মেলনের কর্মসূচী নিম্নরূপ ঃ

১-৬ নং কর্মসূচী অপ্রাসঙ্গিক।

৭. মুসলিম নারীদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন।

৮. নারীদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ।

চিন্তার বিষয় এই যে, মুসলিম নারীদের স্বাধীনতা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাদের সামাজিক বিবর্তনের প্রতি এতোটা আকর্ষণের হেতু কি? আকর্ষণও আবার মিশনারী ও মিশনের সম্মেলনের! এই আকর্ষণও এমন সময় যখন ইসলামী দুনিয়ার পুনর্জাগরণের বিপদ সামনে ছিল এবং এই বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য পরামর্শ আহবান করা হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক বিবর্তনের পরামর্শ পেশ করা হয়।

এসব বিষয়ের প্রতি শেষ পর্যন্ত তাদের আকর্ষণটা কি এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের পূর্বেই এরূপ পরামর্শ আহবানের উদ্দেশ্যই বা কি? পুনর্জাগরণের উপর সর্বশেষ ও প্রবল আঘাত হানার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। নারী স্বাধীনতা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক বিবর্তনের সাথে এসব পরামর্শের সম্পর্কই বা কি?

বিষয়টি কি দৃষ্টি আকর্ষণ মতো নয়? এর মধ্যে কি কোন গূঢ় রহস্য নিহত নেই ? অবশ্যই রয়েছে। আসল ঘটনা এই যে, খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য এবং এর অস্তিত্বকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য যতো আন্দোলনই পরিচালনা করেছে, তার মধ্যে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল সর্বাধিক নিকৃষ্ট।

শুধুমাত্র এই একটি আন্দোলনই মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক, চিন্তাগত ও ধর্মীয় বিপথগামিতা ছড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। এর প্রভাব অবশিষ্ট সব কিছুর সামগ্রিক প্রভাবের চাইতে অধিক ছিল।

একথা পরিষ্কার যে, নারীদের যখন প্রকাশ্য রাস্তায় উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দেখা যাবে এবং তারা লালসাপূর্ণ দৃষ্টির জন্য বিকৃতির উপকরণে পরিণত হয়ে পুরুষের যৌন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করবে, তখন দীন-ধর্ম এবং আকীদা-বিশ্বাস সবকিছুই একটা বাহ্যিক প্রথায় পরিণত হয়ে পড়বে এবং জনগণের মধ্যে নৈতিক বন্ধন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দৃঢ়তার কোন বালাই থাকবে না। এই বিষয়টিই ইসলামের উপর সর্বশেষ ও তীব্র আঘাত হানার জন্য খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদকে মোক্ষম সুযোগ এনে দেবে।

পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বাস্তবিকই মুসলিম নারীরা অজ্ঞতা, পশ্চাৎপদতা, স্থবিরতা, পতন ও দাসত্বের মধ্যে কি নিমজ্জিত ছিলো না? তাদের অবর্ণনীয় অবস্থার দাবি কি এই ছিলো না যে, তাদের স্বাধীনতা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সামাজিক ও মানসিক উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে?

নিঃসন্দেহে একথা স্বস্থানে সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু এই কাজ যখন খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীরা আঞ্জাম দিবে, তখন স্বাভাবিকভাবে মুসলিম নারীদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং ইসলামী সমাজের সংস্কার সাধন তাদের উদ্দেশ্য হবে না। আমরা ইতিপূর্বে মিশনারীদের বক্তব্য উল্লেখ করে এসেছি। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা যা কিছু করে তা মুসলিম সমাজকে ছিন্নভিন্ন করা, তাদের মধ্যে নৈতিক পতন সৃষ্টি করা এবং তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে দুর্বল করে দেয়ার জন্যই করে থাকে।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীরা যখন নারী স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা চালায় তখন তাদের উদ্দেশ্য কখনো এই হয় না যে, সমাজের প্রতিপালন ও ক্রমবিকাশ হোক। বরং নারী স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে স্বয়ং নারীদের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য।

সাম্রাজ্যবাদীরা যখন মুসলিম নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তখন তাদের উদ্দেশ্য কেবল এই হয়ে থাকে যে, তারা যে কোন ধরনের দুষ্কর্ম শিখুক এবং নিজেদের বিকৃতিকে প্রশিক্ষণগত, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও তাত্ত্বিক মূলনীতির

উপর শক্তভাবে স্থাপর করে নিক। সাম্রাজ্যবাদ যখন নারীদের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উন্নয়নের কথা বলে, তখন তার উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, নারীরা বিকৃতি ও ভ্রষ্টতার গভীর কূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাতে পড়ে থাকুক এবং তা থেকে আর যেন বের হয়ে না আসতে পারে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীরা যা চেয়েছিল তাই করেছে এবং তা পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

মুসলিম নারীদের স্বাধীনতা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সামাজিক ও মানসিক উন্নতি ইসলামের কাম্য। কিন্তু ইসলাম এগুলোকে ধর্মীয় ও নৈতিক পতনের ভিত্তির উপর কায়েম করে না, বরং সে এগুলোকে ব্যক্তির সম্ভাব্য উন্নতি ও মর্যাদার ভিত্তির উপর এবং সামাজিক ও নৈতিক পবিত্রতার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। আমি আমার অন্য পুস্তকে ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর স্থান ও মর্যাদার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনারাবৃত্তি অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু সংক্ষেপে একথা বলে দিতে চাই যে, খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামী দুনিয়ায় নারী স্বাধীনতার সমস্যা দাঁড় করিয়ে একটি ভয়ংকর সামাজিক বিকৃতির প্রসার ঘটায়। এর মাধ্যমে তারা ইসলামী সমাজকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চেয়েছিল যেমন ডিনামাইটের বিস্ফোরণে প্রস্তরভূমি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র

এসব কূট-কৌশলের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ মিশনারী প্রচেষ্টাও চলতে থাকে, যা প্রাচ্যবিদরা করে যাচ্ছিল। প্রাচ্যবিদরা একনিষ্ঠভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছে। তারা ইসলামী দুনিয়ায় নিজেদের অনুসারী বুদ্ধিজীবীদের একটি শ্রেণী সৃষ্টি করে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি ব্যাপক ও ভয়ংকর বিপর্যয়ের জন্ম দেয়। এই বিপর্যয়ের বিস্তারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অতঃপর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পর্যায়ক্রমে ব্যাপক সাহায্য করে।

মিশনারীদের প্রচেষ্টার লক্ষ্যবস্তু ছিল যেমন সাধারণ মুসলমান, তেমনিভাবে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের সার্বিক প্রচেষ্টায় লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজ। কেননা এই শ্রেণীটিই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের সৃষ্ট চিন্তাগত, দার্শনিক, আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংশয়-সন্দেহ অনুধাবন করে তার

দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই যেহেতু স্কুল-কলেজ থেকে এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া নিজেদের মধ্যে শোষণ করে নিয়ে থাকে, তাই তারা অতি সহজেই এদের ষড়যন্ত্রজালে জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর নিজেদের বই-পুস্তকে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নিজেদের সভা-সমিতি ও ঘরে এই বিষ ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে হস্তান্তর করতে থাকে। এর ফলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বুদ্ধিজীবীদের এমন একটি শ্রেণী তৈরি হয়ে যায়, যারা সন্দেহ-সংশয় ও সমালোচনা ছাড়া ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না।

আমি আমার 'শুবহাত হাওলাল ইসলাম' (ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম) গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের উত্থাপিত অভিযোগ ও সন্দেহ-সংশয়ের বিস্তারিত জবাব দিয়েছি। এসব সন্দেহকে পুঁজি করে প্রাচ্যবিদগণ অর্থনৈতিক দিক থেকে আরো কতগুলো সন্দেহ উত্থাপন করে থাকে, যেদিকে তারা অধিক নজর দেয় না, যেমন ব্যক্তি মালিকানা, জমিদারী ব্যবস্থা, পুঁজিবাদ ইত্যাদি। আমি উক্ত পুস্তকে আকীদা-বিশ্বাস, ওহী ও নবুওয়াত সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের সৃষ্ট দুর্বল ও অবাঞ্ছিত ধরনের সংশয় ও আপত্তির জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি। কেননা আমি উক্ত পুস্তকে ইসলামকে সমাজের মধ্যে একটি জীবন্ত সত্তা হিসাবে পেশ করতে ব্যস্ত ছিলাম। এই পুস্তকে আমার দৃষ্টির সামনে ইসলামের এদিকটি ছিলো না যে, তা একটি মতবাদ এবং আকীদাও, যা মানুষের চিন্তা-চেতনায় এমনভাবে প্রবাহিত হয় যে, গোটা জীবন তার প্রভাবাধীনে এসে যায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, 'আকীদা', 'ওহী' ও 'নবুওয়াত' সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের আপত্তি এতোটা বাজে ধরনের যে, কোন ব্যক্তি তাকে আলোচনাযোগ্য মনে করে এর জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করে না।

এ ক্ষেত্রে মার্গলিউথের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট, যাকে প্রাচ্যবিদদের ইমাম হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আমাদের এখানেও তার প্রখ্যাত ছাত্রবৃন্দ রয়েছে। তারা প্রাক-ইসলামী কবিতা ও কুরআন মজীদ প্রসঙ্গে তাকে ও তার চিন্তাধারাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্বকোষ (Unisversal History of The World)-এ ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বংশ-পরিচয়-অজ্ঞাত ব্যক্তি ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা তিনি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ ছিলেন। আর আরবরা বংশ-পরিচয়হীন প্রতিটি লোককে আবদুল্লাহ্‌র পুত্র বলতো।"

সমালোচনার ধরনের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় হচ্ছে ঃ তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে কুসাই। তিনি এমন একটি সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, যে সমাজ বংশধারা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতো এবং বংশধারাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতো। যদি সত্যিই তিনি বংশ-পরিচয়হীন হতেন, তাহলে তিনি সেই সমাজের উপাস্য দেবতা, তাদের রীতিনীতি, তাদের ইবাদত-উপাসনা, তাদের অভ্যাস, এমনকি সেই সমাজকে কোন সাহসে চ্যালেঞ্জ করলেন? আর সেই সমাজ তার বংশ-পরিচয়হীন হওয়ার চ্যালেঞ্জ করলো না কেন? চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর এর চেয়ে অধিক দৈন্যদশা আর কি হতে পারে? যাই হোক, আমি এখানে ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের প্রতারণাপূর্ণ বক্তব্য এবং তাদের অভিযোগ ও আপত্তির জবাব দিচ্ছি না, বরং ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরছি।

আমি এখানে লিওপোল্ড ফায়েসের (মুহাম্মদ আসাদ) Islam at the Cross Roads (আল-ইসলামু আলা মুফতারিকিত-তরীক, সংঘাতের মুখে ইসলাম) গ্রন্থের আরবী অনুবাদ থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি লিখেছেন, "কয়েক দশক পরে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অত্যধিক আকর্ষণ ও মনোনিবেশ সহকারে বিদেশী সংস্কৃতির অধ্যয়নে রত হয়েছেন। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে চিরাচরিত অবজ্ঞার অযৌক্তিক প্রকাশভঙ্গী তাদের বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনার মধ্যে প্রকাশ্যভাবেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ইসলামী দুনিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে ইতিহাস যে সমুদ্র খনন করেছে তা অবশিষ্টই রয়ে গেছে। তা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করাই পাশ্চাত্য চিন্তার মৌলিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান যুগের প্রাচ্যবিদ মূলত সেইসব খৃস্টান মিশনারী, যারা ইসলামী দুনিয়ায় কর্মতৎপর রয়েছে, তাদের প্রণীত ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাসের নিকৃষ্ট চিত্র মূলত সেই ভূমিকারই প্রতিনিধিত্ব করে, যা খৃস্টানরা নিজেদের স্বকপোলকল্পিত 'মূর্তিপূজারী' অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবলম্বন করেছে। এতদসত্ত্বেও বর্তমানে প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানসমূহের জন্য ধর্মীয় গোঁড়ামীর ওজর আর অবশিষ্ট থাকেনি, যা প্রতিটি জিনিসকে বিকৃত করে পেশ করার কারণ ছিল। তারপরও তাদের এখানে বুদ্ধিভিত্তিক প্রতারণা যথারীতিই চলছে। প্রাচ্যবিদদের ইসলাম-বিদ্বেষ মূলত একটি মৌরসী স্বভাব এবং

প্রকৃতিগত অভ্যাস। এটা সেইসব প্রভাবের ফল যা ক্রুসেডের যুদ্ধসমূহ পাশ্চাত্যবাসীদের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিয়েছে" (পৃ. ৫৮–৫৯)।

প্রাচ্যবিদগণ নিঃসন্দেহে ইসলামের বিভিন্ন দিকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাদের কর্মপন্থা ছিল সুসংগঠিত। অতঃপর কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তারা যে অপরিসীম চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট স্বীকার করেছেন, তা উপেক্ষা করা যায় না (যদিও কুরআনের আয়াত হৃদয়ঙ্গম করতে এবং ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভুল করেছেন)। এরা যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে পূর্ববর্তী যুগের আরবী বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেছেন, যার সংকলন ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন শৃঙ্খলা ও পূর্বাপর সম্পর্ক ছিলো না এবং যেগুলো অধ্যয়ন করতে গিয়ে স্বয়ং আরবরাও বিরক্তি বোধ করে। অথচ আরবী তাদেরই ভাষা, তারাই এই সম্পদের সংরক্ষক, ধারক ও বাহক, উপরন্তু তারাই এর উত্তরাধিকারী। এসব গ্রন্থের হেফাজত, এর প্রকাশ ও বণ্টন, তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং তার উপর অনুসন্ধান ও গবেষণা করা তাদেরই কর্তব্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এদিকে মনোনিবেশ করেনি।

এসব গ্রন্থের পুনর্বিন্যাস, সূচীপত্র ও শিরোনাম প্রণয়ন, তা সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো এবং তা ছাপানোর ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদরা যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তার স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই (যদিও তারা এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুধাবন ও এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসংখ্য ভুল করেছেন, বরং কোথাও কোথাও হাস্যকর ভুল করেছেন)।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই যাবতীয় শ্রমসাধনার উদ্দেশ্য কি ছিল? তারা কি ইসলামের সেবা করার জন্য এরূপ কঠোর শ্রম স্বীকার করেছেন, না ইসলামের অবয়বকে বিকৃত করা এবং একে জনগণের সামনে অপছন্দনীয় করে পেশ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য ? এই কঠোর শ্রম স্বীকার করার সময় প্রাচ্যবিদদের মধ্যে কি আলেম সুলভ প্রাণশক্তি কার্যকর ছিল না তাদের পোশাকের অভ্যন্তরে কোন মিশনারী লুকিয়ে ছিল, যে তাদেরকে কর্মতৎপর করতো এবং চিন্তার খোরাক সরবরাহ করতো ?

মার্গলিউথের মতো পণ্ডিত ব্যক্তির বিবেক কতো নিচে নেমে গিয়েছিল, যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি

করার চেষ্টা করেন। অথচ আরবে বংশ-তালিকা বা বংশানুক্রমিক সূচীর রক্ষণাবেক্ষণ ছিল একটি অতি পবিত্র দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব সমাজ ও প্রচলিত প্রথার পক্ষ থেকে অর্পণ করা হতো।

গ্রুনিবমের আত্মাই বা কোথায় ছিল যখন তিনি তার The Islam গ্রন্থে লিখেছেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান বলতে তাই বুঝায় যা কেবল ধর্ম অর্থাৎ আখেরাতের কাজে আসবে?" অথচ তিনি এই পুস্তকেই আবার প্রমাণ করছেন যে, "ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা, যা যুগপৎভাবে দীন ও দুনিয়া উভয়কে নিজের মধ্যে শামিল করে নিয়েছে এবং এখানে ধর্ম দুনিয়া থেকে এবং সমাজ শরীআত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না"।

ওয়েলহাউজেনের মধ্যে কি একজন পণ্ডিতের বিবেক বিদ্যমান ছিল, যখন তিনি তার 'আদ-দৌলাতুল আরাবিয়া" (আরব রাষ্ট্র) গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবু বাক্র (রা) ও হযরত উমার (রা) মুসলমানদের কাছ থেকে জোরপূর্বক খেলাফত দখল করে নিয়েছিলেন? অথচ তিনি যদি একথা বলতেন যে, তাঁরা হযরত আলী (রা)-র খেলাফতকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাহলে হয়তো তার কথা এক পর্যায়ে বিবেচনাযোগ্য হতো। কিন্তু তিনি বলেছেন, মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি অন্যত্র লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুর্বল ছিলেন তখন ইহুদীদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি শক্তিশালী হয়ে গেলেন, তখন সন্ধিচুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং জাতীয় গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু ইহুদীরাই যে মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং শত্রুতামূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, ইতিহাসের এই তথ্য এই পণ্ডিত ব্যক্তি এড়িয়ে গেছেন। তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য আরব মুশরিকদের উত্তেজিত করে, মদীনার মোনাফিকদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, বিভিন্ন রকমের গুজব ছড়ায় এবং আরো অগ্রসর হয়ে মদীনারই এক মুসলিম মহিলার উপর হস্ত উত্তোলন করে।

গোল্ডযিহারের মধ্যে সেই পণ্ডিত সুলভ বিবেক কোথায় থাকে, যখন তিনি তার 'আল-আকীদাতুশ শারীআ ফিল ইসলাম' গ্রন্থে লেখেন, "ইসলামের কোন নতুন কথা নেই, এর মধ্যে কোন নতুন চিন্তাদর্শন বিদ্যমান নেই এবং মানবজাতি

সম্পর্কে তার পেশকৃত অধিবিদ্যা কোন নতুন জিনিস নয়। কেননা ইসলামের চিন্তাব্যবস্থা হেলেনীয় চিন্তা-দর্শনেরই উন্নততর রূপ, আর ফিক্‌হী ব্যবস্থা রোমান আইন প্রসূত, এর রাজনৈতিক দর্শন ইরানের রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত এবং এর তাসাউফের উপর রয়েছে বেদান্ত দর্শন ও নিও-প্লেটো দর্শনের ছাপ।"

অনুরূপভাবে মার্গলিউথের শিষ্য কায়িন রবিনের মধ্যেই বা পণ্ডিত সুলভ বিবেক কোথায় ছিল, যখন তিনি 'আল-লুগাতুল কাদীমা ফিল গারবিল বিলাদ' গ্রন্থে লেখেন, "কুরআন মজীদে অনেক শব্দগত ও ব্যাকরণগত ভুল আছে। মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে এই ভুলের সংশোধন করতে থাকে। তারপর এখনও ভুল রয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ)?"

এ ধরনের অসংখ্য বাজে কথা প্রাচ্যবিদদের বই-পুস্তকে রয়েছে যাকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি কখনো বরদাশত করতে পারে না। তা সত্ত্বেও ইসলামী দুনিয়ায় তাদের অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও শিষ্য রয়েছে। এই প্রাচ্যবিদদের ফেতনা এতোটা ব্যাপক যে, অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান তাদের লিখিত বই-পুস্তক পড়ে প্রতারিত হয়ে নিজেদের পুস্তকেও তাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই উদ্ধৃতি কেবল কুরআন ও হাদীস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ইসলামের উপর তাত্ত্বিক আলোচনা করার সময় এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, এমনকি প্রথম যুগের মহান ব্যক্তিদের প্রসঙ্গেও তাদের চিন্তাধারা ও মতামতকে নিজেদের রচনাবলীর উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের এতোটুকুও জানা নেই যে, এসব প্রাচ্যবিদের দৃষ্টির প্রকাশ্য বা গোপন লক্ষ্যবস্তু শুধু একটিই। আর তা হচ্ছে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়া, ইসলামের আসল দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্তর্হিত করা, মুসলমানদের মহান ব্যক্তিদের অবদান সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা এবং দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত মহান ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা।

প্রাচ্যবিদদের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে যখন প্রতিভাবান মুসলিম ব্যক্তিবর্গ নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি, তখন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানদের অবস্থা কি হতে পারে ? বিশেষত যাদেরকে প্রাচ্যবিদরা ইসলাম শিখিয়েছে তাদের অবস্থা তো আরো করুণ। আর যেসব লোক ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণ, ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে কোন অপবাদ- অভিযোগ অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করে

এবং যেসব তথ্য সত্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে, চিন্তাধারাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারে, তা শুনতে মোটেই প্রস্তুত নয়, তাদের অবস্থাই বা কি হতে পারে ? এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ·

"যখন একাকী আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, তখন আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী লোকদের অন্তর ছটফট করতে থাকে। আর যখন তাঁকে ছাড়া অন্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন সহসা তারা আনন্দে ফেটে পড়ে" (সূরা যুমার ঃ ৪৫)।

সত্য কথা এই যে, প্রাচ্যবিদদের এসব চেষ্টা-তদবীর ইসলামের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত ষড়যন্ত্রের একটি অংশমাত্র। আর এটা তাদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট তৎপরতা। মূলত তারা প্রথমে অনুমান করে নিয়েছিল যে, ইসলামের উপর সরাসরি আক্রমণ করা যাবে না, বরং এতে মুসলমানদের বিবেক সজাগ-সচেতন হয়ে যাবে এবং তারা আমাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজেদের দীনের হেফাজতের জন্য এমনকি জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। এজন্য তারা অত্যন্ত প্রতারণাপূর্ণ কর্মপন্থা গ্রহণ করে। তারা মধুর মধ্যে বিষ মিশ্রিত করে পরিবেশন করতে থাকে। প্রথমে ইসলাম ও আল্লাহ্‌র রসূলের গুণকীর্তন করে এবং ইসলামের মহত্ত্বম বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য বর্ণনা করে। মুসলিম পাঠকগণ যখন আশ্বস্ত হয়ে যান যে, এই প্রাচ্যবিদ ইসলামের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং তার অন্তরে কোন কুটিলতা নেই, তখন এই অসতর্ক মুহূর্তে তাদের গরল পান করতে দেয়া হয়। ইসলামের মহত্ত্ব বর্ণনা করার ধারাবাহিকতায়ই ইসলামী আকীদা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করা হয়। অন্তরের গভীরে এবং মন-মানসিকতায় সন্দেহের বীজ বপন করা হয়।

এই হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যায়ের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি। একজন মুসলমান যখন দেখে যে, একজন খৃস্টান লেখক, যার ইসলামের প্রতি ঈমান নেই, ইসলামের এতো প্রশংসা করছে, তখন তার কথা সম্পর্কে এই ব্যক্তির মনে কোনরূপ সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না এবং তার বিশ্বাস জন্মে যে, নিশ্চয়ই এসব আপত্তিকর জিনিস ইসলামে বিদ্যমান আছে যা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

কেননা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অন্ধ বিশ্বাসে ডুবে আছি। এখন আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তিকে ভুল জিনিসগুলো তুলে ধরার এবং সত্য তথ্যকে নিরেট বুদ্ধিভিত্তিক ভঙ্গীতে পেশ করার যোগ্যতা দান করেছেন।

এ ধরনের কোন অসর্তক মুসলমানকে যদি তার বোকামী সম্পর্কে সজাগ করার চেষ্টা করা হয় এবং তাকে বলা হয় যে, এক অমুসলিম ব্যক্তির কাছে এটা কিভাবে আশা করা যায় যে, সে ইসলাম সম্পর্কে সত্য কথা বলবে এবং কিভাবে এমন ব্যক্তিদের দীন শেখার ও বুঝার উৎস হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যে ইসলামের উপর ঈমান রাখে না, তাহলে সে নিজের বোকামীর শিকার হয়ে বলবে, একথা ঠিক যে, এই প্রাচ্যবিদ ইসলামের উপর ঈমান রাখে না, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে যে কথা বলে এবং লেখে, তার সাথে ধর্মীয় গোঁড়ামীর কোন সম্পর্ক নেই।

এটা অত্যন্ত ভালো কথা যে, আমরাও প্রাচ্যবিদদের মতো কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত হই, ধৈর্য সহকারে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পন্থা গ্রহণ করি এবং তাদের মতো বই-পুস্তকের মূল পাঠ ও টীকাসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। যদি আমরা তাদের মতো কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত হই, তাহলে কুরআনের নির্দেশ অনুধাবন, ঘটনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান এবং আমাদের মহান ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রকৃত ও উপযুক্ত স্থানে সমাসীন করার ক্ষেত্রে আমরা তাদের তুলনায় অধিক উত্তম ও নির্ভুল ভূমিকা পালনে সক্ষম হবো। এসবের পন্থা তাদের কাছ থেকে আমাদের শেখা উচিৎ। কিন্তু আমরা যদি দীনের তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্য অনুধাবন করার জন্য প্রাচ্যবিদদেরকে নিজেদের পথপ্রদর্শক হিসাবে স্বীকার করে নেই, তাহলে এটা হচ্ছে সেই খৃষ্টবাদী ফেতনা, যা মুসলমানদেরকে নিজের কব্জার মধ্যে নিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে যাচ্ছে।

আমি প্রাচ্যবিদদের যতো পুস্তক অধ্যয়ন করেছি, আমার মতে তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বই হচ্ছে Islam in modern History আমরা এই পুস্তকের কয়েক জায়গায় উক্ত পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এই পুস্তকেও প্রশংসাসূচক প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন করা হয়েছে অর্থাৎ ইসলামের গুণকীর্তন করতে করতে মাঝখানে নিজেদের বিকৃত চিন্তার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পুস্তকে নিকৃষ্টতার একটি নুতন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। আর তা এই

যে, লেখক তার পুস্তকে এমন সব সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে সম্পর্কে কখনো কল্পনাও করা যায় না যে, পাশ্চাত্যের কোন খৃস্টান কোন অবস্থায় তার স্বীকৃতি দিতে পারেন। এই ব্যক্তির এরূপ করার কারণ হচ্ছে, একান্ত তাত্ত্বিক পরিবেশ ও পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক বিশ্বস্ততার প্রভাব প্রতিফলিত করা এবং কোনরূপ সন্দেহ পোষণের সুযোগ না দেওয়া।

সুতরাং তিনি স্বীকার করছেন যে, পাশ্চাত্য কখনো ক্রুসেডের যুদ্ধসমূহের কথা ভুলতে পারে না এবং ইসলাম যে কয়েক শতক ধরে তাদের ঘরে বসেই তাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে রয়েছিল, তাও তারা কখনো ভুলতে পারবে না।

লেখক উল্লিখিত পুস্তকের ১১১ নম্বর পৃষ্ঠায় এই সত্যকেও স্বীকার নিচ্ছেন যে, খৃস্টবাদ ও ইসলামের মধ্যকার প্রাচীন শত্রুতার কারণে পাশ্চাত্য জগত আরব মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টবাদের সহায়তা করতে থাকে।

তিনি উল্লিখিত পুস্তকের ১০৪-১১৩ পৃষ্ঠায় একথা স্বীকার করেছেন যে, "ইউরোপ ইসলামকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং হীনমন্যতাবোধে লিপ্ত করার জন্য নিজেদের সামরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় অস্ত্র, উপায়-উপকরণ ও শক্তি ইসলামী দুনিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছে।"

লেখক যখন ইসলাম ও খৃস্টবাদের ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে তুলনা করেন, তখন নিজের পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে স্বীকার করেন যে, খৃস্টবাদী আকীদা-বিশ্বাসের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নেতিবাচক চিন্তার ধারক ও বাহক, অপরপক্ষে ইসলামের ঘটনাবলী, এমনকি ইসলামের ত্যাগ স্বীকারও ইতিবাচক ফলাফলের অধিকারী।

একজন খৃস্টান তার জীবনকে এজন্য বাজি রাখে, যাতে ইতিহাসের বিপরীতমুখী গতির প্রতিরোধ করতে পারে, যা সামনে অগ্রসর হতে পারলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। তার আত্মত্যাগের উদ্দেশ্য হয় ইতিহাসের বিচ্যুত গতিকে প্রতিরোধ করা। সে তার দিক পরিবর্তন ও গতিধারা সংশোধন করার চেষ্টা করে না, অথচ মুসলমানরা যখন জীবন দান করে তখন ইতিহাসের গতি বদল করে ছাড়ে।

চিন্তা করুন, পাশ্চাত্যের একজন খৃস্টানের কাছে এর চেয়ে অধিক ভালো কথা আর কি আশা করা যেতে পারে ? এই ধরনের স্বীকৃতির পরও কি তার কোন বক্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা যায় ? এরপরও কি তার উদ্দেশ্য ও নিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় ? অথচ তিনি তার এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখেছেন, "তুর্কী রাষ্ট্র ধর্মহীন (Secular) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র শপথ ! তা মুসলিম রাষ্ট্র এবং তা কখনো ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়নি। বরং ইসলামের নতুন ব্যাখ্যার পথ অনুসরণ করে ধর্ম ও রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ, ধর্ম ও প্রচলিত রীতিনীতি, ধর্ম ও অর্থনীতি, ধর্ম ও আইন-বিধান এবং ধর্ম ও কর্মময় জীবনের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।"

তিনি আরো বলেন, 'তুরস্কই মূলত সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, গোটা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে তারই অনুসরণ করা উচিত। তাহলে তারা তুরস্কের মতো শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবদিক থেকেই উন্নতি লাভ করতে পারবে।"

এর পরও কি আমরা তার সৎ উদ্দেশ্যের স্বীকৃতি না দিয়ে পারি? অথচ সবাই জানে, নব্য তুরস্ক শক্তিহীনতা, দারিদ্র্য অপমান ও বিজ্ঞানের শক্তি থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপরও কি তার সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ করা যায়, যখন তিনি তাঁর পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে বলেন, 'পাকিস্তান টিকে থাকবে না। কেননা সে তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধর্মীয় ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, এটা হচ্ছে একটা নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত, যা থেকে মুসলমানদেরকে দূরে থাকা উচিৎ।"

অথচ তিনি অন্যত্র তার একথা ভুলে যাচ্ছেন এবং উক্ত পুস্তকের একই অধ্যায়ে ২২৫ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "পাকিস্তানের ব্যর্থতার কারণ এই যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব লাভ করার পর থেকে যে দলটি দেশের সর্বময় কর্তৃক হস্তগত করে রেখেছে, তারা ইসলামী প্রাণসত্তার অধিকারী ছিলো না এবং তারা ইসলামের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। মূলত এটা সেই দল, যাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে জন্ম দিয়েছে এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের মেজাজের নিকটতর করে নিয়েছে"।

লেখক উল্লিখিত পুস্তকের শেষদিকে এক দীর্ঘ ও পেঁচালো আলোচনা করার পর লিখেছেন, "বর্তমান যুগে জীবিত থাকার জন্য মুসলমানদেরকে তাদের মৌলিক চিন্তা ও আকীদা পরিত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ ইসলাম শুধু মুসলিম সমাজেই কায়েম থাকতে পারে এবং তাদেরকে এই আকীদা গ্রহণ করতে হবে যে, মুসলমানরা অনৈসলামিক সমাজে বসবাস করলে কেবল নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের সীমা পর্যন্তই মুসলমান থাকবে।"

যে ব্যক্তি উক্তরূপ পরামর্শ দিতে পারে, তাকে কি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলা যায়? সমস্ত প্রাচ্যবিদ ও মিশনারীদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতার লক্ষ্য ছিল এটাই এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড়ো আকাঙক্ষা ও উদ্দেশ্যও ছিল তাই (অর্থাৎ মুসলমানরা আকীদা-বিশ্বাসের সীমা পর্যন্তই মুসলমান থাকবে এবং জীবনের যাবতীয় কাজকর্মে খৃস্টানদের অনুসরণ করবে)।

এরপরও কি লেখকের উদ্দেশ্যকে সৎ বলা যায় ? এটা মূলত বর্তমান যুগের একটি ক্রুসেড (যুদ্ধ), যা ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। এই ওয়েলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মীথ তার Islam in Modern History গ্রন্থে ইসলাম ও খৃস্টবাদের মধ্যে বিরাজমান শত্রুতার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমরা সংঘাতের এই দীর্ঘ ইতিহাসকে এখানে কখনোই এই উদ্দেশ্যে পুনরাবৃত্তি করছি না যে, পুনর্বার এই আগুন জ্বলে উঠুক অথবা মতবিরোধ মাথাচাড়া দিক, বরং আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এই কথা বলা যে, আমরা যে এই দু'টি ব্লকের মধ্যে সমঝোতা ও সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছি, তাতে অনতিবিলম্বে সফলতা অর্জনের আশা করা উচিৎ নয়" (পৃ. ১১)।

আমরাও এখানে লেখকের বক্তব্যের প্রথমাংশ পুনর্বার উল্লেখ করে বলতে চাই, আমরাও এখানে সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা এই উদ্দেশ্য নিয়ে উল্লেখ করছি না যে, মুসলমানদের হৃদয়ে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক, বরং আমরা শুধু এ কথাই বলে দিতে চাই যে, কোথায় কোথায় ও কি কি উপায়ে ইসলামের উপর হামলা করা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যে কি কি উপায়-উপকরণের সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং সংঘাতের ফলে পাশ্চাত্যের কি উপকার হয়েছে, তারা কি ফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলমানদের বর্তমান বংশধররা (Generation) মূলত এই ক্রুসেড যুদ্ধের ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে (এই বর্তমান বংশধররা কেবল ইসলামের নামটুকুই জানে

এবং তারা মনে করে যে, ইসলাম গুটিকয়েক আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সমষ্টি। এগুলো পালন করলেই ইসলামের পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্বসমূহ আদায় হয়ে যায়)। অথবা এই ক্রুসেডের ফলস্বরূপ এমন বংশধর সৃষ্টি হয়েছে, যারা ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হয়ে আছে এবং এর বেশী কিছু জানে না। এই ক্রুসেডের ফলস্বরূপ আজ একজন মুসলমান বলে, আমি যদি নামায পড়ি এবং রোযা রাখি, অতঃপর নিজের জন্য ইসলাম বিরোধী ব্যবস্থা থেকে চিন্তা, রীতিনীতি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ধার নেই, তাহলে এতে আমার ইসলামের কোন ক্ষতি হয় না।

এই ক্রুসেডের উৎপাদন হচ্ছে সেইসব মুসলিম নারী যারা মনে করে, আমার নিয়াত যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি যে কোন ধরনের পোশাক ইচ্ছামতো পরিধান করতে পারি, যুবকদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারি এবং যে কোন ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। এসব কিছু করলে আমার মুসলমানিত্বের মোটেই অঙ্গহানি হবে না।

ক্রুসেডের আরো অনেক মারাত্মক ফল হচ্ছে সেইসব মুসলিম নারী-পুরুষ, যারা প্রকাশ্যভাবেই ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে এবং ধর্মকে স্থবিরতা, পশ্চাৎপদতা ও অবনতির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করছে।

এতদসত্ত্বে শুধু ক্রুসেড যুদ্ধই ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসকে ছিন্নভিন্ন করার একমাত্র কারণ এবং মুসলমানদেরকে সম্ভাব্য সকল পন্থায় ইসলাম বিমুখী করার একমাত্র হাতিয়ার ছিলো না। বরং এর পাশাপশি আরো অনেক উপায় ও পদ্ধতি বর্তমান রয়েছে এবং ইসলামকে তার মূল থেকে উপড়ে ফেলার অপচেষ্টায় রত আছে। এই উপায় ও পদ্ধতিগুলো কেবল ইসলামী দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং একটি বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের আকার ধারণ করেছে।

৫

বিপর্যয়ের বিশ্বব্যাপী ঢেউ

বিপর্যয়ের বিশ্বব্যাপী প্লাবন প্রসারিত হয়ে যখন ইসলামের উপর প্রভাবশালী হতে আরম্ভ করলো, তার পূর্বেই ইসলামী দুনিয়া এই বিপর্যয়ের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়ে তার প্রভাবের সামনে মাথা নত করে দিয়েছিল এবং ইসলামী দুনিয়ার কাছে প্রতিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি অবশিষ্ট ছিলো না। এই প্লাবন কেবল ইসলামের উপরই আঘাত হানেনি, বরং প্রতিটি ধর্মীয় আকীদার উপর আঘাত হেনেছে। কিন্তু ইউরোপে এই সর্বগ্রাসী ঢেউ সেখানকার স্থানীয় পরিবেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক বিকাশের ফল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে এটা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি, বরং পর্যায়ক্রমে এসেছে। কিন্তু ইসলামী দুনিয়া এই প্লাবনের সাথে পূর্বে কখনো পরিচিত ছিলো না এবং তার প্রভাব গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ছিলো না। ইসলামী দুনিয়ার স্থানীয় পরিবেশের এটা দাবিও ছিলো না এবং এর পরিবেশের সাথে তার কোন সম্পর্কও ছিলো না। বরং এটাকে অস্বাভাবিকভাবে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইসলামী দুনিয়া যদি অতীতের ন্যায় স্বাধীন, শক্তিশালী ও সুদৃঢ় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে এই বিপর্যয় তার বুনিয়াদকে নড়বড়ে করতে এবং ইসলামের তাৎপর্যগত অর্থের মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন করতে সক্ষম হতো কিনা তা সন্দেহের ব্যাপার ছিল। ইসলামী দুনিয়া যখন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল তখন তাকে দুর্বল করার জন্য যেসব কার্যকারণ সক্রিয় ছিল এবং যে বিষ তাকে পান করানো হচ্ছিল, তার ফলেই সে দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। অতঃপর এই বিশ্বগ্রাসী তুফানের সামনে দুর্বলের মতো মাথা নত করে দেয়া ছাড়া ইসলামের আর কোন উপায় ছিলো না। প্রতিরোধ করার সামান্য শক্তিও তার অবশিষ্ট ছিলো না।

এই তুফান, ইউরোপ যার নাম দিয়েছে 'উন্নতি ও প্রগতি', এতোটা অপরিহার্য ছিলো না যতোটা অপরিহার্য তারা মনে করে। কিন্তু ইউরোপের জন্য তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। কেননা এটা ছিলো সেখানকার স্থানীয় অবস্থার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির ফল। তা সত্ত্বেও ইউরোপে এটা তেমন কোন অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার ছিলো না। ইউরোপ ইচ্ছা করলে অন্য কোন আদর্শ বা মতবাদের

উপর ঈমান এনে এই প্লাবনের প্রভাব ও তার বিস্তৃতি রোধ করতে পরতো। কিন্তু সে এটা করতে চায়নি। কারণ ক্রমবিবর্তন এমনটা চাচ্ছিলো না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ‏.

"নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে" (সূরা রা'দ ঃ ১১)।

যাই হোক, এই পন্থায় উন্নতি ও ক্রমবিবর্তন আসাটা সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্বের জন্য এবং বিশেষভাবে ইসলামের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিলো না।

ইসলামকে যে গোটা দুনিয়ার বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের মোকাবিলা করতে হয়েছে, তা ইতিহাসের কোন নতুন ঘটনা নয়। গোটা দুনিয়ার আকীদা-বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে ইসলাম তার নিজের বিশেষ তাৎপর্য, মূল্যবোধ ও মূলনীতির উপর কায়েম রয়েছে। পরিশেষে এই তাৎপর্য, মূল্যবোধ ও মূলনীতিসমূহ প্রভাবশালী হয়ে মানবতাকে ভ্রান্ত পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছে।

যে যুগে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিলো তখন সারা দুনিয়া নিজেদের রাজা-বাদশা, নেতা ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের নিষ্পাপ মনে করতো এবং আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তাদের পূজা-উপাসনায় মশগুল ছিল। গোটা দুনিয়া গাইরুল্লাহর পূজায় লিপ্ত—এই রাজনৈতিক মতবাদ কি ইসলামের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে গিয়েছিল? ইসলাম এসে তো ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের শিখিয়েছে, "আমি যতোক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো, ততোক্ষণ তোমরা আমার কথা শুনবে এবং আমাকে মানবে। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করি, তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না।"

ইসলাম আরো শিখিয়েছে, "যদি আমি ভালো কাজ করি তাহলে আমার সাহায্য করো। আর যদি আমি খারাপ কাজে লিপ্ত হই, তাহলে আমাকে সংশোধন করো।"

তারা যেন মুসলিম উম্মাতকে নিজেদের যাবতীয় কাজকর্মের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিলেন এবং শাসকগণ নিজেরাই উম্মাতের কাছে আবেদন করছেন, উম্মাত যেন তাদের কার্যাবলীর হিসাব গ্রহণ করতে থাকে।

ইসলামের আবির্ভাবকালে সারা দুনিয়ায় নৈতিক বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছিল। সেজন্য নৈতিকতার প্রচলিত অর্থ যা খুব সম্ভব সে যুগের "উন্নত অর্থ" বলে বিবেচিত ছিল, ইসলামী সমাজের জন্যও কি তা গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল? অন্যথায় ইসলামের জন্য উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া কি সম্ভব ছিলো না? ইসলামী সমাজ তার যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও ইসলামের পবিত্র সমাজ হিসাবে বিরাজমান ছিল.... ....যতক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ ও মিশনারী সংস্থাগুলো (গত দুই শত বছর ধরে) তাকে ধ্বংস করা এবং তার চরিত্রকে বিকৃত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়নি।

ইসলামের আবির্ভাবের যুগে দুনিয়ায় বন্য আইন প্রচলিত ছিল। শক্তিমানরা দুর্বলদের মস্তক চূর্ণ করতো। মানবতার এই পতনশীল অর্থ (ইউরোপ যাকে নিজের পুনর্জাগরণের পর উন্নত অর্থ হিসাবে গণ্য করেছে) ইসলামের জন্য গ্রহণ করা কি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল ? বরং ইসলাম এসে সমাজের মধ্যে সবল ও দুর্বলের মধ্যে সহযোগিতার মূলনীতি নির্দিষ্ট করলো এবং এক হাজার বছর পর্যন্ত তা কার্যকর ছিলো।

অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি ততোক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী হয় না, যতোক্ষণ মানুষ তার ইতিবাচক ভূমিকা পরিত্যাগ করে নিজেকে পরিস্থিতির হাতে ছেড়ে না দেয়। এই অবস্থায় পরিস্থিতির নির্মমতা স্বাভাবিকভাবেই তাকে সেই স্থান পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়, যেখানে গিয়ে তুফানের জোর শেষ হয়ে যায় অথবা যেখানে পৌঁছে মানুষের মধ্যে অবিচলতা ও প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হয় না। এই পরিবর্তন তখন অবশ্যম্ভাবী মনে হয়, যখন মানুষ নিজেকে দুর্বল মনে করে। যেমনটি খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় প্রতিটি স্থানে ইসলামের অবস্থা হয়ে গেছে।

খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদই তার অধীনস্থ ইসলামী দুনিয়ার মন-মগজে এই কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ যেখানে অবশ্যম্ভাবী বিষয়, সেখানে তার মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলও নিহিত রয়েছে। এই কথা বুঝানোর উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও আকীদার সামান্য কিছুও যদি অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে তাও যেন বিপর্যয় ও ধ্বংসের এই তুফানের মোকাবিলায় জয়যুক্ত হতে না পারে। এই নিকৃষ্ট চিন্তাকে তাদের মনে আরো অধিক মজবুত করার জন্য এই ধারণায় লিপ্ত করে দেয়া হয় যে, এই কল্যাণকর পরিবর্তনের বিরোধিতা করা পশ্চাৎমুখীনতা, স্থবিরতা, অবনতি ও পতনের নামান্তর। আর কোন মানুষের এই নিকৃষ্ট

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া উচিৎ নয়, বরং এর প্রভাব থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ। এইরূপ মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবার পর কোন ব্যক্তি এই গর্তে নিমজ্জিত হয়ে নিজের উপর পশ্চাৎপদতা, স্থবিরতা ও নিম্নগামিতার দোষ আরোপ করা পছন্দ করবে কি? এই অবস্থায় সে বাঁচার রাস্তা এই দেখতে পাবে যে, এই তুফানের সাথে তাকে ভেসে চলতে হবে এবং 'প্রগতিবাদী' 'উদারমনা' প্রভৃতি ভালো ভালো উপাধিতে তাকে ভূষিত হতে হবে।

কয়েক বছর পূর্বেকার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো, যা সমুদ্র সৈকতে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এক যুবতী বালুর উপর বসে থেকে আলোকচিত্র শিল্পীকে দিয়ে নিজের ছবির পোজ দিচ্ছিল। তার পরিধানে ছিলো সামান্যতম পোশাক। নিজের অবশিষ্ট সামান্যতম লজ্জার কারণে সে দুই হাঁটু একত্র করে বসা ছিল। ফটোগ্রাফার ছিল যেহেতু এক প্রগতিবাদী যুবক, তাই সে প্রগতিবাদী পোজ নিতে চাচ্ছিল। সে যুবতীর নিকট গিয়ে তার হাঁটুদ্বয় ফাঁক করতে চাইলো। কিন্তু যুবতী নিজের অবশিষ্ট লজ্জার কারণে তাতে রাজী হচ্ছিল না। এই অবস্থা দেখে ফটোগ্রাফার চিৎকার করে বললো, হায় ! আমার মনে হয় তুমি গ্রাম্য মেয়ে। তা না হলে তুমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারতে না। একথা শুনামাত্র মেয়েটির চোখ, নাক-মুখ ও দেহে যে লজ্জাটুকু অবশিষ্ট ছিলো তাও কর্পূরের মতো উবে গেলো। নির্দ্বিধায় নিজের হাঁটুদ্বয় ফাঁক করে দিয়ে একটি সুন্দর ও প্রগতিশীল ছবির পোজ দেয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে গেলো।

দুর্বল ও নিঃস্ব মুসলমানদেরকেও সাম্রাজ্যবাদীরা এই ধরনের শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করতো। আরে মিয়া ! তুমি তো দেখছি সেই আসহাবে কাহ্ফের যুগের লোক। তা না হলে তুমি এরূপ করবে কেন ? একথা শুনা মাত্রই তার প্রতিরোধ শক্তি দমে যেতো এবং নিজের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জাগ্রত হতো। এভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানদের জ্ঞানবুদ্ধি, চিন্তা- চেতনা ও যোগ্যতাকে হরণ করে নেয়। এভাবে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বসতভূমি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির লীলাভূমিতে পরিণত হয়।

নিশ্চয় শিল্প বিপ্লব বিভিন্ন দিক থেকে কল্যাণকর ছিল। কিন্তু খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ শিল্প ও কারিগরি বিপ্লবকে কি ইসলামী বিশ্বে প্রবেশ করতে এবং তাকে শিল্পে সমৃদ্ধ হতে দিয়েছে? সাম্রাজ্যবাদ কি পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে ইসলামী বিশ্বে তার আগমন প্রতিরোধ করেনি এবং ইসলামী দুনিয়াকে অর্থনৈতিক ও

কারিগরি দিক থেকে পশ্চাৎপদ রেখে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করেনি ? উন্নতির নামে সে এখানে কেবল নৈতিক ও ধর্মীয় বিকৃতিই ঘটিয়েছে। কেননা এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ্‌র চরিত্রকে ধ্বংস করার এবং তাদের সামগ্রিক শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল। খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ শিল্প ও কারিগরিকে বিশ্বের সমৃদ্ধি ও উন্নতির বাহন বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও ইসলামী বিশ্বে শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নতির প্রতিটি উপায় এবং সাফল্য অর্জনের প্রতিটি পথ বন্ধ করে রেখেছিল।

এটি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত। তা এজন্য উল্লেখ করা হলো যে, হয়তো এর মাধ্যমে মুসলমানদের মন-মগজে বদ্ধমূল অসংখ্য অর্থহীন ধারণার বাস্তব রূপ তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদীদের বিভ্রান্তিকর পরিভাষা 'উন্নতি', 'প্রগতি' ইত্যাদির আসল রহস্য হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হবে।

এখন শুধু এটা দেখাই অবশিষ্ট আছে যে, কোন্ বিশ্বব্যাপী প্লাবনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী দুনিয়ার কপাট খুলে দিয়েছিল এবং একে প্রতিরোধ করার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছিল আর এর উপর অবিচল থাকার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে পশ্চাৎপদতা ও স্থবিরতা নাম দিয়ে তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল ?

দুই শতাব্দী ব্যাপী এই তথাকথিত উন্নতি ও প্রগতির কাহিনী কয়েকটি পংক্তির মধ্যে বর্ণনা করা কোন সহজ কাজ নয়। আমি আমার 'মা'রাকাতুত তাকালীদ' (মতবাদের দ্বন্দ্ব) গ্রন্থের 'জাওলাতুম মাআত্-তারীখ' (ইতিহাসের সাথে পরিক্রমা) অধ্যায়ে বলেছি যে, উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে স্বয়ং ইউরোপের অভ্যন্তরে অবস্থার গতি কি ছিল। ইউরোপীয় জাতিসমূহ কোন কোন অবস্থার প্রভাবাধীন ধার্মিকতা এবং নিজেদের ধর্মীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করে এমন জাতিতে পরিণত হলো, যাদের না আছে কোন ধর্ম, আর না আছে কোন ধর্মীয় রীতিনীতি ও মূল্যবোধ। আজ তারা সম্পূর্ণ নাস্তিক্যবাদী পরিবেশে যে কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে পশুর মতো যাবতীয় প্রকারের ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আছে।

ডারউইনের পশুবাদ ও গির্জার মধ্যকার বিরোধ

আমি এই পুস্তকে লিখেছি, উন্নতি ও প্রগতির এই চিত্রের মধ্যে ডারউইনের উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। তিনি ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ সনে তিনি নিজের লিখিত পুস্তক Origion of Species (আসলুল আনওয়া) প্রকাশ করেন এবং ১৮৭২ সনে Origin of Man (আসলুল ইনসান) প্রকাশিত হয়।

বই দু'টি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে নড়বড়ে হয়ে যায়। কেননা ধর্ম মানুষ সম্পর্কে এই ধারণা দিয়েছিল যে, সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ একটা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী সত্তা। তার প্রাণসত্তা সমস্ত জীব থেকে ভিন্নতর। এই একটি সত্যের ভিত্তিতেই তার মধ্যে যাবতীয় আধ্যাত্মিক, জৈবিক, ধর্মীয় ও চিন্তাগত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত ছিল, অন্যান্য জীবের মধ্যে যার কোন অস্তিত্ব নেই।

পাশ্চাত্যের লোকদের মধ্যে এসব মূল্যবোধ কি পরিমাণে বিদ্যমান ছিল সেই প্রশ্ন না তুলে বলা যায়, তাদের মধ্যেও মোটামুটি এসব মূল্যবোধ বর্তমান ছিল। কিন্তু ডারউইন ঘোষণা করলেন, মানুষের গুরুত্ব এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, সে একটি উন্নত জীব। মনে হয়, মানুষ যেন একটি জন্তু। না আল্লাহ তার মধ্যে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন, আর না তার সৃষ্টির মধ্যে কোন উন্নততর শক্তি কার্যকর আছে। মানুষ হলো পশুর মধ্যকার একটি চরম উন্নত রূপ। পশুর উপর তার কেবল এতোটুকু অগ্রাধিকার রয়েছে, যা সে লাখো বছরের ক্রমবির্তনের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

মানুষের স্থান ও মর্যাদার প্রসংগ নিয়ে ডারউইন ও গির্জার মধ্যে চরম বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেলো। গির্জা কর্তৃপক্ষ ডারউইনকে নাস্তিক ও কাফের ঘোষণা করলো। আর ডারউইন গির্জার উপর অজ্ঞতা ও অশ্লীল কথনের অভিযোগ আনেন। প্রথমদিকে জনগণ গির্জার পক্ষে ছিল। কেননা ডারউইন মানুষের অবমূল্যায়ন করে তাকে বিকৃত আকারে উপস্থিত করেছিলেন। এটা জনগণের কাছে অত্যন্ত খারাপ মনে হচ্ছিল। ডারউইন মানুষকে আসমানী রূহ থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করেন এবং পৃথিবীতে তাকে উচ্চ মর্যাদা থেকে নামিয়ে দিয়ে শুধু একটি ভোগবাদী প্রাণী সাব্যস্ত করেন।

কিন্তু অতি শীঘ্রই জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তারা গির্জার বিরুদ্ধে এবং ডারউইনের পক্ষে চলে আসে। আসলে গির্জাকে খৃস্টবাদের মেজাজ অনুযায়ী দয়া, অনুগ্রহ ও আধ্যাত্মিকতার ধারক ও বাহক হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে তা স্বৈরাচারী শক্তি এবং মানুষকে অপমান করার যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। সে মানুষের উপর বিভিন্ন রকমের জরিমানা ধার্য করতো। গির্জা মানুষের অর্থ-সম্পদের উপর কর ধার্য করার সাথে সাথে তাদের চিন্তাশক্তির উপরও জরিমানা আরোপ করে রাখতো। উচ্চ হারে খাজনা আদায় করার পরও

সে মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতো। জনগণকে ধর্মীয় নেতাদের সামনে অপমানকর অবস্থায় মস্তক অবনত করতে হতো। অনন্তর আসমানী নির্দেশের নামে জনগণের উপর বিশেষ কতগুলো মনগড়া মতবাদ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। যদি কোন ব্যক্তি এসব মতবাদের বিরোধিতা করতো, তাহলে তাকে নাস্তিক, কাফের এবং ধর্ম থেকে বিচ্যুত ঘোষণা করা হতো।

দীর্ঘকাল ধরে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও রোষানলে পতিত জনগণ গির্জার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের একটি বিরল সুযোগ পেয়ে গেলো। সুতরাং তারা ডারউইনের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হলো। জনগণের আক্রোশ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলো। তারা গির্জাব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, বরং তারা মনে করতে লাগলো, গির্জা যতোই পবিত্র হোক না কেন, তা তো মানুষেরই তৈরী। ব্যাপার এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং ধর্মকে শেষ করে দেয়া এবং ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর পাশ্চাত্য ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে রোমান যুগে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ নাস্তিক্যবাদী দৃষ্টিভংগী নিয়ে প্রতিমার নামে জড় পদার্থের পূজায় নিমজ্জিত হয়ে ইউরোপের ঈমান এখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যের আওতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের সার্বিক চেষ্টা-সাধনা কেবল "নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক", এই দর্শনকে কেন্দ্র করে চলছে।

অতঃপর বস্তুবাদের এই তুফান জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, চরিত্র-নৈতিকতা, রীতিনীতি এবং লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, মোটকথা জীবনের সব বিভাগ বস্তুবাদের থাবার মধ্যে এসে যায়। অতঃপর ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং 'মানুষের কর্মচাঞ্চল্যের' যৌনভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু হয়। এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যাও মূলত ডারউইনের ব্যাখ্যারই বিস্তারিত রূপ। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ফল এই হলো যে, গোটা মানব জীবনে শুধু বস্তুবাদী জীবনধারা এবং মানব ইতিহাসকে পেটের অন্ন সংগ্রহের ইতিহাস হিসাবে সাব্যস্ত করা হলো।

বস্তুবাদ ও যন্ত্রশক্তি

একটি নতুন মতবাদ অস্তিত্ব লাভ করলো। তা এই যে, বস্তুগত শক্তিই মানবীয় জীবনের কাঠামো নির্ধারণ করে থাকে এবং মানুষের চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের পুনর্গঠন করে। চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস স্বয়ং কোন মূল্যবোধ নয়, আর তা মানুষকে গতিশীল করার কার্যকর হাতিয়ারও নয়, তা

মানুষের বাস্তব জীবনের পন্থা ও গতিধারাও নির্ধারণ করে না। বরং এই মূল্যবোধসমূহ বস্তুগত ও নৈতিক পরিবর্তনের ফল এবং এই পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই দুনিয়ায় ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা ও রীতিনীতি বলতে অপরিবর্তনশীল স্থায়ী কোন মূল্যবোধের অস্তিত্ব নেই। অপরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনযোগ্য কোন জিনিসই নেই। প্রতিটি যুগেই তার মেজাজ-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু মতবাদ ও মূল্যবোধ প্রচলিত থাকে। তা কেবল সেই যুগের জন্যই নির্দিষ্ট এবং সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্য কোন যুগের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই।

ধর্ম, নৈতিকতা ও রীতিনীতি ইত্যাদি সামন্তবাদী যুগের ধ্যান-ধারণা ও তার অপরিহার্য বিষয়। যন্ত্রশক্তির যুগে এসব জিনিসের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এটা স্বাধীন যুগ, নিজের যন্ত্রের মতো স্বাধীন। এর উপর শুধু যন্ত্রের প্রতিপত্তি থাকবে। এই যুগই নিজের প্রয়োজনীয় তাৎপর্য ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে নিচ্ছে। এর সাথে ধর্মের কোন যোগসূত্র নেই। কেননা বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরির এই যুগে মানবতা যে কোন প্রকারের বাধা-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। তার ধর্মের আর কোন প্রয়োজন নেই। আজকের মানুষ এমন দৃশ্যমান জগতে বসবাস করে, যাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করা যায়। আধিভৌতিক চিন্তাধারা, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, আজকের মানবতার ক্রমবিকাশের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। এগুলো সবই মরুযুগের বাসী কথা। এ যুগে তা সম্পূর্ণ অচল।

মানুষের জীবনধারার যৌনভিত্তিক ব্যাখ্যা মানুষের কাজকর্মকে যৌন প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। দুধ পানের মাধ্যমে শিশু যৌনস্বাদ উপভোগ করে। যৌন আবেগেই সে কথাবার্তা বলে, যৌনস্বাদ পাবার জন্যই সে নিজের আংগুল চোষে এবং জৈবিক আকর্ষণেই সে তার মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে। পিতা যখন এই পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তখন মাতৃ-প্রেমের জটিলতা সৃষ্টি হয়। এই জটিলতা মায়ের প্রতি বাচ্চার যৌন আকর্ষণকে দমিয়ে দেয়। এর ফলে নানা রকম মূল্যবোধ অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন ধর্ম, নৈতিকতা, রীতিনীতি, বিবেক ইত্যাদি। কিন্তু এসব মূল্যবোধের অন্তরালে মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে যৌন আবেগ।

এই চাপ, যার ফলে ধর্ম, মূল্যবোধ নৈতিকতা ও রীতিনীতি অস্তিত্ব লাভ করেছে, একটি ক্ষতিকর মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া। এর ফলে মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা ও স্নায়বিক জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং তার কর্মশক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব এই

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার পরিসমাপ্তি হওয়া দরকার। তাহলে মানুষ স্বাধীন পরিবেশে শ্বাস গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

'ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা' এবং 'মানব প্রকৃতির যৌনবাদী ব্যাখ্যা', এই দু'টি মতবাদের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে যে পরিবর্তন ও বিবর্তন সূচিত হয়েছে, একান্তভাবেই তার বুনিয়াদ হচ্ছে পশুবাদ। ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ যখন কেবল উন্নততর পশু, এর চেয়ে অধিক কিছু নয়, তখন এই দু'টি বস্তুবাদী ও পশুবাদী ব্যাখ্যা, এই পশু প্রকৃতির মানুষের সাথেই খাপ খায়।

পাশ্চাত্য যে কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে ডারউইনের খনন করা এই গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অতঃপর জীবনের প্রতিটি বিভাগ থেকে যে কোন প্রকারের আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে নির্বাসন দিয়েছে, তার গোটা জীবন, যা মানুষের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ ছিল, শুধু বস্তুবাদী হয়ে রয়ে গেছে।

ধর্ম, নৈতিকতা ও রীতিনীতি যেহেতু বস্তুবাদী দর্শন ও পাশবিক লীলা চরিতার্থ করার পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ, তাই এসব মূল্যবোধকে যে কোন প্রকারেই হোক খতম করতে হবে। এগুলোর মূলোৎপাটনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাবতীয় মতবাদ, আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। বরং এমন তাত্ত্বিক মতবাদ উদ্ভাবন করা উচিৎ যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম হচ্ছে নষ্টের মূল, নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের জন্য ক্ষতিকর বাধ্যবাধকতা এবং রীতিনীতি হচ্ছে এমন দুর্গন্ধময় পোশাক, যা প্রগতিবাদী প্রতিটি মানুষের ছিঁড়ে ফেলে দেয়া উচিৎ। আরো এমন মতবাদ আবিষ্কার করা উচিৎ, যার আলোকে যৌনলালসা কেবল জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত ক্রিয়া সাব্যস্ত হবে, যার সাথে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক থাকবে না। প্রতিটি যুবক-যুবতীকে যৌন-বিনোদনমূলক কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করা উচিৎ, যেভাবে তারা একত্রে পানাহার করে। তাহলে তাদের আত্মা শান্ত্বনা লাভ করতে পারবে, স্নায়ুতন্ত্রিগুলোও শান্ত থাকবে এবং উভয়ের মন-মানসিকতা সৃজনশীল কাজের জন্য মুক্ত থাকবে।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এসব মতবাদ গোটা পাশ্চাত্য সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং কোথাও তা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। পাশ্চাত্যবাসীরা বলতে লাগলো, এর নাম হচ্ছে উন্নতি ও প্রগতি এবং এটা হচ্ছে একটি ক্রমবিবর্তন, যার পথে কোন শক্তিই বাধা দিয়ে টিকে থাকতে পারবে না। যেসব লোক এর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

করার চেষ্টা করছে, তারা নির্বোধ, সেকেলে মানসিকতা সম্পন্ন, পশ্চাৎপদ ও স্থবির। অতঃপর প্রাচ্যের বরকন্দাজ তোতা পাখিরাও এই অপবাদ রটাতে শুরু করলো। তারা নিজেদের অন্তর দিয়ে কখনো এটা চিন্তা করে দেখেনি যে, এই মতবাদ ও দৃষ্টিভংগী বৈধ কিনা ? যদিও ধরে নেয়া যায় যে, এই মতবাদ ও দৃষ্টিভংগী পাশ্চাত্য জীবনের মেজাজ-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু প্রাচ্যের জীবনের সাথেও কি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ, না অসামঞ্জস্যপূর্ণ? যদি পাশ্চাত্যে এটা সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির স্বাভাবিক ফল হয়ে থাকে, তাহলে প্রাচ্যের পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে কি?

গোলামী বিবেক

প্রাচ্যবাসীরা এসব কথা চিন্তা করে দেখেনি। কেননা তাদের বিবেক গোলামে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর গোলামরা কখনো নিজেদের মনিবদের না সমালোচনা করতে পারে, আর না তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস রাখে। ইউরোপ ভুল করতে পারে ? মনিবের তুলনায় গোলাম কি কখনো অধিক জ্ঞানী হতে পারে ? না, কখনো নয়। এরূপ কথা কখনো চিন্তা করাও উচিৎ নয়।

সব কিছুই সম্ভব, কিন্তু পাশ্চাত্য থেকে আগত চিন্তাধারা ও মতবাদের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা কি করে সমালোচনা করতে পারি ? পাশ্চাত্যের কাছে মেশিন আছে, যা আমাদের কাছে নেই। তাদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, শক্তি আছে, আমাদের কাছে এর কোনটিই নেই। বরং তারা আমাদের মালিক, হর্তাকর্তা। আর আমরা তো নিজেদের সত্তারও মালিক নই।

যদি পাশ্চাত্য বলে যে, ধর্ম কোন জিনিসই নয়, তাহলে ধর্ম কোন জিনিসই নয়। যদি তারা বলে, চরিত্র বলতে কোন জিনিস নেই, তাহলে তাদের কথাই ঠিক। যদি তারা বলে, রীতিনীতি বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, তাহলে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কেননা আমরা যদি তাদের এসব কথা সমর্থন না করি, তাহলে আমরা পশ্চাৎপদ বলে অভিহিত হবো। আমাদের বলা হবে, উন্নতি, প্রগতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, উত্থান ও বিবর্তনের কি তোমাদের প্রয়োজন নেই ? যদি এসব জিনিসের প্রয়োজন থেকে থাকে, তাহলে ধর্মের মতো পূঁতিগন্ধময় জিনিসকে পরিত্যাগ করো, নৈতিকতার অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাও এবং রীতিনীতির মতো লজ্জাকর জিনিস পরিহার করো। যাবতীয় বাধাবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাও, স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করো এবং শিকল ছিঁড়ে ফেলো।

যুবক-যুবতীগণ ! এই বিস্মৃত রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করো, যার সাহায্যে পিতামাতা তোমাদের বেঁধে রেখেছে। তোমাদের পিতা-মাতা প্রাচীনপন্থী, আর তোমরা হচ্ছো আধুনিকতাবাদী বংশধর। তোমরা সেকেলে রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী হতে পারো না। তোমরা এমন প্রতিটি কাজ করো যা পাশ্চাত্যবাসীরা করে থাকে। যুবক-যুবতীর বন্ধুত্ব স্থাপন, চুম্বন, অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি। তাহলে উদ্বৃত্ত যৌনশক্তি খরচ হয়ে যাবে এবং তোমাদের স্নায়ুমণ্ডলী শান্ত হয়ে থাকবে।

অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদ এই তোতা পাখিদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো এবং গোলামদের কার্যকলাপ দেখে আনন্দিত হয়ে হাততালিও বাজাতো।

ইউরোপ যদিও পাশবিকতার মাতলামীতে লিপ্ত হয়ে এই পাশবিক অধঃপতনকে উন্নতি, প্রগতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অগ্রগতি মনে করে বসছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সার্বিক দিক থেকে বিপর্যয় ও বিকৃতিতে লিপ্ত হয়নি। তার মধ্যে প্রকৃতির কতিপয় গুণও বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে, "কর্মতৎপরতা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, সংগঠন, কঠোর পরিশ্রম এবং বিরামহীন অধ্যবসায়।" তাদের এসব গুণ আজ পর্যন্ত নৈতিক বিপর্যয় ও অপমানকর পশুবৃত্তির শিকার হয়নি।

কিন্তু প্রাচ্যের গোলামের মধ্যে এই গুণ কোথায় বর্তমান ছিলো ? তারা এই উন্নতির ভার বহন করতে সক্ষম ছিলো না। প্রাচ্যের অবস্থা ছিলো এই যে, প্রথমে তুর্কী শাসনের অধীনে তার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল, অতঃপর সে সাম্রাজ্যবাদের খপপরে পড়ে যায়। সে ইসলামের কাছ থেকে যে গুণ-বৈশিষ্ট্য লাভ করছিল তার অবশিষ্ট চিহ্নটুকুও পাশ্চাত্যের আক্রমণে নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রাচ্যে বরং ভিন্ন ধরনের বিপ্লব ও বিবর্তন আসার প্রয়োজন ছিল, যা তাকে হারানো মানবতা ও হারানো শক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হতো এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতা ও রীতিনীতির বাস্তব মূলনীতির উপর দাঁড় করিয়ে দিতো। তা তার দেহে আভ্যন্তরীণ দুনিয়ার জন্য প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তি দান করতো এবং বহির্দুনিয়ায়ও তা একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতো।

সাম্রাজ্যবাদ সেসব ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করতে উদগ্রীব ছিল, যেসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো মূলত এই ধরনের বিপ্লব সাধন। কিন্তু খৃস্টান

সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পাশবিক উন্নতির জন্য প্রাচ্যের দরজাগুলো খুলে দিতে থাকলো এবং তার পথ সমতল করার জন্য এবং সর্বত্র তার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নিজের প্রশিক্ষণ দেয়া তথাকথিত বুদ্ধিমান গোলামদেরকে বেতনের বিনিময়ে এই সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নতি-প্রগতির ঢোল পেটাতে নিয়োগ করলো।

আমরা পাশ্চাত্যের কল্পিত উন্নতির আর একবার মূল্যায়ন করে দেখবো। ডারউইনের মতবাদের কারণে মানুষের মধ্যে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-লালসার আকর্ষণ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই আকর্ষণ যদিও নতুন কোন জিনিস নয়, পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ মানব প্রকৃতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ‏.

"লোকদের জন্য তাদের মনঃপূত জিনিস—নারী, সন্তান, সোনা-রূপার স্তুপ বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষিভূমি বড়োই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৪)।

একথা ঠিক যে, পার্থিব জিনিসের প্রতি আকর্যণ কোন নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এই প্রকৃতিগত আকর্ষণ ও আবেগকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখার জন্য তার সাথে আরো কতিপয় উন্নত ও চিরস্থায়ী মূল্যবোধ মানুষকে দান করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ‏. قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ‏.

"প্রকৃতপক্ষে উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে। বলো, আমি কি তোমাদের বলে দিবো যে, এসবের তুলনায় উত্তম জিনিস কোনটি? যারা তাকওয়া

অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট জান্নাত রয়েছে, যার পাদদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পুত-পবিত্র স্ত্রীগণ তাদের সংগী হবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয় তাঁর বান্দাদের উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৪, ১৫)।

ধর্মীয় জীবনে বিশেষভাবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র পন্থায় স্বাদ আস্বাদনকে অনেক দূর পর্যন্ত জায়েয ও বৈধ রাখা হয়েছে। শুধু এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, স্বাদ আস্বাদনের জন্য অন্তরের মধ্যে যেন এমন বিকৃতি সৃষ্টি না হয়, যার ফলে মানুষ নির্লজ্জ হয়ে সেই স্রোতে ভেসে যাবে এবং মানুষের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যাবে। কিন্তু ইউরোপ উন্নতি ও প্রগতির উন্মাদনায় ধর্মের সীমা থেকে একেবারেই বাইরে চলে গেছে এবং সে যাবতীয় শর্ত ও নীতিমালাকে ছিন্ন করে ফেলেছে, যা স্বাদ আস্বাদনের আকঙক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতো।

ইউরোপে স্বাদ আস্বাদনের শুরু হয় যৌন অনাচার থেকে। কিন্তু সে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেমে থাকেনি, আর এমনি হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কেননা এই জমীনের গোটা ইতিহাসে আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী নিয়ম এই যে, বিশ্ব-ইতিহাসের সভ্যতাগুলোর মধ্যে যে সভ্যতাই পার্থিব স্বাদ আস্বাদনের সীমা অতিক্রম করেছে, তার সূচনা হয় যৌন স্বাদ আস্বাদন থেকে। অতঃপর এই প্রবণতা জীবনের সব বিভাগে প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত এর ফল এই দাঁড়ায় যে, সেই সভ্যতা ভোগ-বিলাসিতা এবং পশুত্বের নিম্নস্তরে পৌঁছে যায়।

ইউরোপেও উন্নতি ও প্রগতির এই তুফানের ফলও তাই হয়েছে। শিল্প ও কারিগরি উন্নতি এবং উৎপাদনের উপায়সমূহের মধ্যে পেশাগত ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এই বিপর্যয়কে আরো দ্রুততর করেছে। গোটা জীবনই আধুনিক শিল্প ও সভ্যতার রং-এ রঞ্জিত হয়ে গেছে। চলচিত্র, রেডিও, টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক গাড়ী, সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র, আরামদায়ক বিছানা, মোটকথা শিল্প ও প্রযুক্তি জীবনকে সুন্দর ও পরিপাটি করতে এবং আকর্ষণীয় ও লোভাতুর করে পেশ করতে নিজের যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেছে। এই জীবনধারা স্বয়ং কোন দূষণীয় ব্যাপার নয়, বরং আসল বিপর্যয় জীবনের উপর কর্তৃত্বশীল মূল্যবোধসমূহের অবক্ষয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

চিন্তার বিষয় এই যে, যেসব লোক এই নানা প্রকারে উপাদান (জীবনোপকরণ) বাড়ানোর কাজে অনন্তর নিরত রয়েছে এবং যারা এই উপকরণসমূহকে হাতে তুলে নিচ্ছে, তাদের দৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত কি? আমরা এখানে পুঁজিবাদ, তার উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার শোষণমূলক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন তত্ত্বগত আলোচনায় লিপ্ত হতে চাই না যে, তা নিপুণভাবে লাভের বিরাট অংশ পুঁজিপতিদের পকেটে তুলে দেয় ইত্যাদি। আমাদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটি এর চেয়ে গভীর ও সুদূর প্রসারী। কেননা সমাজতন্ত্রের ভাষায় পুঁজিবাদীদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন। অতএব পুঁজিপতি যদি ক্রেতাদের মধ্যে এতোটা আগ্রহ ও উৎসাহ দেখতে না পেতো, তাহলে সে নিজের এই মুনাফাখোরী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ভিন্ন কোন উপায়-উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা চালাতো।

অতএব ভোগ-বিলাসের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণই হচ্ছে আসল সমস্যা। ইউরোপে তা মানুষ সম্পর্কে বস্তুবাদী ও পশুবাদী ব্যাখ্যার ছত্রছায়ায় জন্ম নিয়েছে এবং ইহূদীবাদ অ-ইহূদীদের ধ্বংস করার জন্য এটা তাদের মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছে। কারণ ইহূদীবাদ যেদিন বিশ্বের জাতিসমূহকে ভোগ-লালসা ও কাম-প্রবৃত্তির শিকলে পূর্ণাংগভাবে বন্দী করতে সক্ষম হবে, সেদিন ইহূদীরা তাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারবে।

ব্যাপার আর যাই হোক, একটি কথা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, ভোগবাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ বর্তমান সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই সভ্যতা গোটা দুনিয়ায় তার বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। বিভিন্ন জাতির জীবনে তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, আমাদের মতে এর গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে, ভোগবাদের প্রতি আকর্ষণের এই মহামারী যেখানে যেখানে পৌঁছেছে, সেসব দেশে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভংগীর উপর কি প্রভাব পড়েছে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্স ধ্বংস হয়েছে এবং অন্যান্য দেশেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হচ্ছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ভোগবাদের প্রতি সীমাতিরিক্ত আকর্ষণের মধ্যে পরিষ্কার বিরোধ রয়েছে। বিরোধের কারণ এটা নয় যে, ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম

ভোগসামগ্রী সংগ্রহ করাকে হারাম ঘোষণা করে অথবা তার বিরোধী। বরং ইসলমের ঘোষণা ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ٠

"হে নবী! এদের বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্য উপকরণ বের করেছেন এবং তাঁর দেয়া পাক রিযিকসমূহ কে হারাম করেছে" (সূরা আরাফ ঃ ৩২)?

তাহলে বিরোধ এইজন্য যে, সীমাতিরিক্ত ভোগবিলাস অন্তরে বিকৃতি, কর্মবিমূখতা, আরামপ্রিয়তা ও কপটতা সৃষ্টি করে। ফলে দুনিয়ার প্রতি মানুষের এতোটা ভালোবাসা হয়ে যায় যে, সে আখেরাতকে ভুলেই বসে এবং যেসব প্রতিবন্ধকতা ও বাধ্যবাধকতা তাকে ভোগ-লালসা চরিতার্থ করতে বাধা দেয়, সেগুলোকে ঘৃণা করতে থাকে। আখেরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য তার উপর আরোপিত হয়, তা সে পরিত্যাগ করে।

বর্তমানে এই বিপর্যয়ই সংঘটিত হচ্ছে। কেননা যখনই মানুষ ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হয়ে যায়, তখন সে ধর্মের গণ্ডী থেকে বহু দূরে চলে যায়, ধর্মীয় বিধিনিষেধকে ঘৃণা করতে থাকে। সে কামনা করে যে, এই বাধ্যবাধকতা যদি চিরদিনের জন্য খতম হয়ে যেতো অথবা শিথিল হয়ে যেতো, তাহলে কতোই না ভালো হতো।

সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায় ইসলামী বিশ্বে যখনই বস্তুবাদী সভ্যতার ঢেউ এসে গেলো, তখন তার সাথে সাথেই লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসিতার আকর্ষণও সভ্যতা, প্রগতি ও উন্নতির নামে এখানে মহামারীর আকারে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ভোগের প্রতি সীমাতিরিক্ত আকর্ষণ মনের গভীরে প্রোথিত আকীদা-বিশ্বাসকে এসিডের মতো খেয়ে ফেলেছে।

যেসব আরামদায়ক উপকরণের মাধ্যমে সময় বাঁচানো যায় এবং কষ্ট লাঘব হয়, ইসলাম তাকে হারাম ঘোষণা করে না। যেমন মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ, রেলগাড়ী, রেফ্রিজারেটর, কাপড় কাঁচার যন্ত্র, রুটি বানানোর যন্ত্র ইত্যাদি। ইসলাম মূলত চলচ্চিত্র, রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদিরও বিরোধী নয়।[১] কিন্তু

---

১. আমার লেখা "ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম" গ্রন্থের "ইসলাম ও সভ্যতা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (গ্রন্থকার)।

বিলাসিতা, যৌনতা ও অশ্লীলতার পেছনে যে দৃষ্টিভংগি কার্যকর রয়েছে, ইসলাম তার বিরোধী। বর্তমান যুগে রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে নৈতিক বিকৃতি ছড়ানো হচ্ছে, ইস্লাম তার চরম বিরোধী। সত্য কথা হচ্ছে, এই বিষবাষ্প পাশ্চাত্য থেকে ছড়াতে ছড়াতে প্রাচ্যে পৌঁছে গেছে। এখানে তাকে বিবর্তন, উন্নতি, প্রগতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা হচ্ছে। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যেসব কার্যকারণ পূর্ব থেকে তৎপর ছিল, তার আরো পরিবৃদ্ধি ঘটেছে রেডিও-টিভির মাধ্যমে।

নারী স্বাধীনতা প্রসংগ

নারীদের ক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন, সমানাধিকার ও পর্দাহীনতার আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমি আমার 'মা'রিকাতুত-তা'কালীদ' (আদর্শের সংঘাত), 'শুবহাত হাওলাল ইসলাম' (ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম) এবং 'আত-তাতূরু ওয়াস-সিবাত' (বিবর্তন ও স্থবিরতা) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে কেবল এতোটুকুই বলা যথেষ্ট যে, ইউরোপে এসব আন্দোলন ছিলো সেখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দার্শনিক ফল। কিন্তু ইউরোপবাসীর দৃষ্টিভংগী যদি আজকের মতো না হতো, তাহলে ইউরোপে এই আন্দোলনের কারণে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হতো না। আর ইসলামী বিশ্বে অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণই বিদ্যমান ছিলো না। কেননা এখানে উল্লিখিত আন্দোলনের অনুকূল কারণ ও পরিবেশ মোটেই বিদ্যমান ছিলো না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, বিষয়টির দু'টি দিক রয়েছে এবং উভয় দিকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একটি দিক এই যে, ইসলামী আইনকে প্রকাশ্যভাবে লংঘন করে মুসলিম নারীদেরকে অজ্ঞতা, গোলামী ও পশুবৎ অবস্থায় নিমজ্জিত রেখে বাস্তবিকপক্ষেই তাদের উপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তার মূলোৎপাটন করতে হবে। দ্বিতীয় দিক এই যে, এই যুলুমের মূলোচ্ছেদ করানোর জন্য এমন নিকৃষ্ট ও অপমানকর পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা কেবল সমাজের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না, বরং তার কারণে স্বয়ং নারীদের মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হবে এবং তারা যৌন সম্ভোগের উপকরণে পরিণত হবে, যে-ই সুযোগ পাবে তার কাছ থেকে যৌন স্বাদ আস্বাদন করবে।

মূলত ইউরোপীয় নারী স্বাধীনতার দুঃখজনক পরিণতি তখনই শুরু হয় যখন শিল্প ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত সমাজের পুরুষরা নারীদের ভরণপোষণ ও ব্যয়ভার বহন করা থেকে কাপুরুষের মতো পিছু হটে দাঁড়ায়। অতএব নারীরা তখন নিজেদের ভরণপোষণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরিবারের ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাইরে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। এ সময় শিল্পপতিরা তাদের শোষণ করে এবং তাদেরকে পুরুষের অর্ধেক পরিমাণ মজুরী দেয়। অথচ নারীরা পুরুষদের সাথে সমপরিমাণ সময় কারখানায় কাজ করতো। এই তথাকথিত ইনসাফকে কেবল পাশ্চাত্যের তথাকথিত উন্নত ও ভদ্র বিবেকই বরদাশত করতে পারে।

এই অবস্থায় নারীদের জন্য নিজের প্রকৃতিগত ও যুক্তিসংগত অধিকার দাবি করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না। সুতরাং নারীরা এই উদ্দেশ্যে হরতাল, শোভাযাত্রা, প্রচারণা ও প্রচার মাধ্যমের সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে। কিন্তু পরে তারা অনুমান করলো যে, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তাদেরকে আইন প্রণয়নেও শরীক হতে হবে। কেননা পাশ্চাত্যে স্বার্থবাধী লোকেরা আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই শোষণ করে থাকে। ইসলামের মতো সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন বলবৎ নেই, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র সমস্ত বান্দার প্রতি নজর রাখা হয়েছে। অতএত নারীরা প্রথমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, জাতীয় পরিষদের সদস্যপদ, বেতন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকার দাবি করলো। অতঃপর তাদের দাবির ফিরিস্তি দীর্ঘ হতে থাকলো এবং আরো কতগুলো ব্যাপারে সমানাধিকারের দাবি উঠতে লাগলো।

পুরুষরা নারী সমাজের এসব দাবির শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা ধর্ম ও রীতি-নীতির দোহাই দিলো, অথচ পুরুষরা ধর্ম ও ধর্মীয় রীতি-নীতিকে ইতিপূর্বেই পেছনে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু নারীদের দমিয়ে রাখার জন্য এই ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহা করতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হলো না। এটা একটা স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত কথা যে, ইউরোপ যে পরিবেশে জীবন যাপন করছিল এবং যে ধরনের বিকৃত মতবাদ তাদের উপর চেপে রয়েছিল তাতে নারীরাও ধর্মীয় রীতি-নীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং নৈতিক অবক্ষয়কে গ্রহণ করার জন্য পুরুষের সমান অধিকার দাবি করে। সুতরাং পাশ্চাত্যের নারীরা একের পর এক নিজেদের সমস্ত অধিকার আদায় করে নেয় এবং তার সাথে সাথে পাপ কাজ করার অধিকারও লাভ করে। এই শেষোক্ত অধিকারটি নারীরা পুরুষের সহায়তায় ও সহযোগিতায় অর্জন করেছিল। পুরুষরা

বুঝে ফেললো যে, এভাবে নাপাক পন্থায় যৌনস্বাদ উপভোগ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেবল পরিবেশকে অনুকূল বানানোর প্রয়োজন হবে।

অতঃপর নারীরা হাট-বাজার, দোকানপাট ও কল-কারখানায় পৌছে গেলো। তারা যুগপৎভাবে অর্থও উপার্জন করতে থাকলো এবং বিকৃতিও ছড়াতে থাকলো। ফ্রয়েডের যৌনশিক্ষার প্ররোচনায় সীমাতিরিক্ত যৌনাচার প্রবণতা এবং ইহুদীদের ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের ধ্বংস সাধন ও কাম লালসার দ্বারা তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার গোপন ষড়যন্ত্রের অধীনে নারীরা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সমস্ত কৌশল আয়ত্ত করে নেয়।

মূলত কথা শেখা বা শেখানো নয়, তাদের এর কি-ই বা প্রয়োজন ছিল। নিজেকে পরিপাটি করে সাজিয়ে অন্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা এবং এই উদ্দেশে যাবতীয় অস্ত্র ব্যবহার করা নারীর স্বভাব।[২] কিন্তু চিন্তা ও দৃষ্টিভংগীর বিভিন্নতা এবং সামাজিক পার্থক্যের ভিত্তিতে এই অস্ত্রও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, সাজগোজ করে পরিপাটি হওয়া অর্থাৎ রূপচর্চা এবং বিপর্যয় সৃষ্টি ও বিকৃতি ছড়ানো দু'টি ভিন্ন জিনিস। প্রথমটি পবিত্র ও বৈধ, এবং শেষোক্তটি অপবিত্র ও অবৈধ।

কিন্তু ইউরোপ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নতি-প্রগতির প্লাবন পবিত্র পন্থা অনুসরণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। সে তো ফ্রয়েডের কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করে নিয়েছিল যে, মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে 'সাধুতা ও পবিত্রতা' বলতে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই। আর সাধুতা ও পবিত্রতা হচ্ছে একটি মানসিক চাপ (Supprssion) যা মানবীয় অস্তিত্বের জন্য ধ্বংসকর। তাই নারীদেরকে তাদের দুষিত ও নিকৃষ্টতম অস্ত্র-শস্ত্রসহ ময়দানে এসে যেতে হবে এবং নিজেদের যাবতীয় চিত্তহারিণী অস্ত্রের সাহায্যে কাজ নিতে হবে। যদি তার অন্য কোন উদ্দেশ্য, যেমন প্রেমিক বা স্বামী সংগ্রহ করার প্রয়োজন নাও থাকে, তাহলে সৌন্দর্যের প্রদর্শনী ও বিকৃতির উপকরণ সরবরাহ অবশ্যই উদ্দেশ্য।

বিকৃতির উপরকরণ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী কেবল পুরুষদের বিভ্রান্ত করা ও তাদের মন আকর্ষণ করার জন্য। এর আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারীরা যেন অনুভব

২. নিজেকে পছন্দনীয় ও আকর্ষণীয় করার প্রবণতা নারী-পুরুষ প্রত্যেকের মধ্যেই স্বভাবগতভাবে বর্তমান রয়েছে। কিন্তু নারীরা যখন ধর্ম ও মূল্যবোধের আওতায় থেকে সংস্কৃতিবান না হয়, তখন দৈহিক সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করার মাধ্যমে আকর্ষণীয় হওয়ার দিকে অধিক ঝুঁকে যায়।

করতে পারে যে, তাদের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি রয়েছে এবং এই শক্তিবলে তারা পুরুষদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষেই তারা পুরুষদের উপর বিজয়ী হয়েছে। কেননা পুরুষরা যদি ডারউইনের পশুবৎ মানুষ হয়ে থাকে, ফ্রয়েডের দর্শন অনুযায়ী যে কোন বিধি-নিষেধের বন্ধন থেকে যৌন আবেগের অধীন হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে যদি সীমাতিরিক্ত ভোগ-লালসার প্রবণতা বিদ্যমান থেকে থাকে তাহলে এই শ্রেণীর পুরুষদের উপর সব সময় যৌন প্রবত্তির কর্তৃত্ব বিরাজমান থাকবে এবং দৈহিক কামলালসাকে উত্তেজিত করার প্রতিটি উপাদান তার জীবনের উপর রাজত্ব করতে থাকবে।

এ কারণে মনোহারিণী নারী এই ধরনের পুরুষের স্নায়ুতন্ত্রীর উপর সওয়ার হয়ে থাকে এবং সে নিজের প্রকৃতিগত মানসিকতার দ্বারা অনুভব করে নিয়েছে যে, তার মনোহারিণী শক্তি যতোই বৃদ্ধি পাবে, এই কামুক পুরুষের উপর তার প্রতিপত্তি ও প্রাধ্যান্য ততোই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ কারণেই চিত্তাকর্ষণ ও মনোহরণ তার দৃষ্টিতে একটি উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে এবং এই আকর্ষণীয় শক্তিকে স্বামী অথবা প্রেমিক সংগ্রহের উপায় বানানোর প্রয়োজন আর থাকলো না। বরং এটা এখন নির্বিশেষে যে কোন পুরুষকে লোভাতুর বানানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে অথবা অন্ততপক্ষে তা নারীর মনে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে, সে কোন পুরুষের মনে রাণীর আসন দখল করে আছে।

নারীর জীবন এমন এক জুয়াড়ীর জীবনে পরিণত হয়ে গেছে যাকে কঠোর পরিশ্রমও করতে হয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সে তার শ্রমের পূর্ণ মজুরীও পায় না। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের বিনিময় সে তার চিত্তহারিণী শক্তির মাধ্যমে পুরুষদের উপর প্রাধ্যান্য বিস্তারকে মনে করে অথবা সে যে কোন না কোন পুরুষের মন দখল করে আছে, এই অনুভূতিকে নিজের দুর্ভাগ্যের বিনিময় মনে করে।

এই মনোহরিণী অস্ত্রের মাধ্যমে পুরুষের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করার পরিণতিতে একদল নারী নিকৃষ্টভাবে এমন বিকৃতির শিকার হয়ে পড়েছে যে, অতঃপর তা থেকে নিস্তার পাবার আর কোন পথ পাচ্ছে না। এই বিকৃতিকে প্রসারিত করার জন্য উলংগ ছবি, যৌন পত্রিকা বা পর্ণোগ্রাফি, চরিত্র বিধ্বংসী নাটক ও উপন্যাস এবং অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ পত্রপত্রিকা ছাড়াও অনান্য উপায়ে এতো অধিক পরিমাণে শয়তানী প্রোপাগাণ্ডা করা হয়েছে যে, প্রতিটি স্থানে বিকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং গোটা দুনিয়া গণিকালয়ে পরিণত হয়েছে।

এই হচ্ছে ইউরোপের সেই উন্নতি ও প্রগতি, যাকে পাশ্চাত্যবাসীরা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বিবর্তন নাম দিয়ে গোটা মানবজাতির উপর চাপিয়ে রেখেছে এবং যার কারণে ধর্ম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সামান্য অংশ যদিও বা কোথাও অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাও খতম করে দিতে চাচ্ছে। ইসলামী বিশ্বে এই তথাকথিত উন্নতির ঢেউ পৌঁছে যাওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, যা প্রথমেই ইউরোপে উত্থিত হয়েছিল এবং সে সব ধরনের বিকৃতির সামনে হাঁটু গেড়ে মাথা নত করে দিয়েছিল।

ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে সেখান থেকে অনুকরণপ্রিয়তাও ইসলামী দুনিয়ায় আমদানী হয়। ফলে কোনরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই বিভিন্ন জিনিস গ্রহণ করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম উম্মাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে বিলীন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই অনুকরণপ্রিয়তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে পাশ্চাত্য থেকে বিপথগামিতা ও উলংগপনার যাবতীয় উপকরণ ও কলাকৌশলও ইসলামী দুনিয়ায় পৌঁছে যায়। কেননা সেখানে তো প্রতিটি জিনিস প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল, যাতে তা সুযোগমতো নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়া যায়।

সুতরাং মুসলিম মহিলারাও রাস্তাঘাটে পুরুষের মন আকর্ষণকারী ও বিকৃতি সৃষ্টিকারী সমস্ত কলাকৌশল আয়ত্ত করে নেয়। কেননা তারাও নিজ নিজ দেশে এবং নিজ নিজ ভাষায় অশ্লীল ছায়াছবি, উলংগ ও অর্ধউলংগ নারীচিত্র সম্বলিত পত্রপত্রিকা এবং গল্প-উপন্যাসের আকারে পুরুষের মন আকর্ষণকারী সমস্ত উপকরণ পেয়ে গেছে। অতঃপর মুসলিম নারীরা পত্রপত্রিকায় যৌন আকর্ষণমূলক প্রবন্ধ ও গল্প লেখার যোগ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকও পেয়ে গেছে। তারা বিস্তারিতভাবে বলে দিতে লাগলো, নারী কিভাবে পুরুষের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় হয়ে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং তার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে, ঘরে এবং বাইরে পুরুষের কামুক দৃষ্টি আকর্ষণ করার কৌশল কি!

পোশাক-পরিচ্ছদ ও রূপসজ্জা কিভাবে অন্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উপায়ে পরিণত হতে পারে, চালচলন, উঠাবসা, কথাবার্তা ও দৃষ্টি বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তাও তারা আয়ত্ত করে নিয়েছে। এখন বস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, পুরুষদের প্রলুব্ধ করা এবং নিজের দিকে আকৃষ্ট করাই মুসলিম নারীদেরও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। তারা এখন নিজেদের মনোহারিণী

শক্তিকে স্বামী সংগ্রহের উপায় মনে করে না ; তাছাড়া নারী স্বাধীনতার ধ্বজাধারী সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের উৎসাহে তারা পুরুষ বন্ধু সংগ্রহ করার অধিকারও পেয়ে গেছে। মুসলিম নারীদের জীবনেও পুরুষের মন জয় করার উদ্দেশ্য এই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তার মধ্যে যেন এই অনুভূতি বিদ্যমান থাকে যে, সে রাস্তার মাথায় অথবা অফিস-আদালতে পুরুষদের সামনে নিজের মনোহারিণী শক্তির প্রদর্শনী করে তাদেরকে যতোটা বিভ্রান্ত করতে পারে সে ততোটাই সজীব। বরং মুসলিম নারীরা অশ্লীলতার দিক থেকে পাশ্চাত্যের নারীদেরও ছাড়িয়ে গেছে। কেননা এ সময় প্রাচ্যসমাজ চরম বিশৃংখলার শিকার হয়ে পড়েছিল, আইনের বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং হৃদয়ের গভীরেও জীবনের কোন উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিলো না।

এভাবে ইসলামের অবশিষ্ট অংশটুকুও খতম করার সর্বশেষ ষড়যন্ত্রও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। ইসলামী দুনিয়ায় বরং গোটা দুনিয়ায় এই ভয়ংকর ঘটনার পর এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার যে পূর্ণাংগ ও নিকৃষ্ট তৎপরতা চালানো হয়েছিল, তাতে জমীনের বুকের সমস্ত শক্তি অংশগ্রহণ করে। এরপরও কি আশা করা যেতে পারে যে, জমীনের বুকে কোথাও ইসলাম ও মুসলমান অবশিষ্ট রয়ে গেছে?

এরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কোন মুসলিম পুরুষ বা স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কি করে সম্ভব হতে পারে ? কেননা বিকৃতি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর উদ্দেশ্যই ছিলো এই যে, জমীনের বুকে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটাই অসম্ভব করে তুলতে হবে। এরপরও যদি কোথাও কিছু সংখ্যক মুসলমানের অস্তিত্ব অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে এই ভূপৃষ্ঠকে তাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত করতে হবে। যে কোন দিক থেকে জাহান্নাম, যুলুম-অত্যাচারের জাহান্নাম, সংকীর্ণ অবস্থা ও অস্থিরতার জাহান্নাম। বরং মনস্তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক, চিন্তাগত ও সামাজিক দিক থেকেও এই ধরাপৃষ্ঠকে তাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত করতে হবে। তারা নিজেদের চতুর্দিকে দেখতে পাবে অমুসলিম সমাজের বেষ্টনী। তাছাড়া অব্যাহত সমালোচনা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ঘৃণা-বিদ্বেষের মাধ্যমে তাদের পরিবেশকে জাহান্নামে পরিণত করতে হবে। মুসলিম নারীদের জন্য তো তা বিশেষভাবেই জাহান্নাম হবে। কেননা তারা নিজেদের চারপাশে বিদেশী ফ্যাশনের পোশাক-পরিচ্ছদের সমারোহ দেখতে

পাবে। তারা যে কোন দিক থেকে বন্ধনমুক্ত একটি স্বাধীন পরিবেশে নিজেদেরকে উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও তিরস্কৃত দেখতে পাবে। এটা নিশ্চয় আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" উচ্চারণকারী কোন মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে।

কিন্তু তবুও আমি যদি আপনাদের বলি যে, এরপরও ভবিষ্যৎ ইসিলামের জন্য এবং নিঃসন্দেহে ইসলামের জন্য, তাহলে আপনারা কি আশ্চর্য হবেন, অস্থির হয়ে পড়বেন?

৬

ভবিষ্যত ইসলামের জন্য অপেক্ষা করছে

ভবিষ্যত ইসলামকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে ? একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যেরূপ ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানো হয়েছে, ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ছাড়াও বিশ্বব্যাপী যে ব্যাপক অপ-তৎপরতা চলছে, তার সবগুলোর মূল্যায়নই আমরা এই পুস্তকে করেছি। এই মূল্যায়নকে সামনে রেখে কোন ব্যক্তি কি উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলোর ইতিবাচক উত্তর দিতে প্রস্তুত হবে? হাঁ প্রস্তুত হবে।

খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। ইসলামী দুনিয়াকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছে। অতঃপর প্রতিটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে এদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ হানাহানি ও শত্রুতার বীজ বপন করেছে। প্রতিটি মুসলিম দেশে ধর্মকে সমাজ থেকে এবং শরীআতকে জীবন ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ইসলমের পুনর্জীবনের জন্য যেসব আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং যা ইসলামকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গঠনমূলক ও কর্মক্ষম শক্তিতে পরিণত করতে চাচ্ছিল, তার প্রতিটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এমন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নব্য যুব সমাজকে ইসলামের ঝর্ণাধরা থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং তাদের মন-মগজে ইসলাম সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহের বীজ বপন করে দিয়েছে।

খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ প্রতিটি মুসলিম সমাজে বুদ্ধিজীবীদের এমন একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়েছে, যারা ইসলামের প্রতি উদাসীন ও ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করছে। তারা ইসলামকে স্থবির, সেকেলে ও পশ্চাৎপদ মনে করছে। বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্য থেকে যদি ইসলামের দিকে প্রতাবর্তন করার আহবান জানানোর জন্য এমন কোন আন্দোলনের সূচনা হতো, তাহলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ সেই আন্দোলনকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পন্থায় নিশ্চিহ্ন করে দিতো। কেননা এর অর্থ ছিল, খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ গত দুই শতাব্দী ধরে যে চেষ্টাসাধনা চালিয়েছে তা অর্থহীন হয়ে পড়া।

সাম্রাজ্যবাদ তার এসব চেষ্টায় সফলও হয়েছে। সে মুসলমানদের কেবল নিজেদের ধর্ম থেকেই দূরে সরিয়ে দেয়নি, বরং ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করে দিয়েছে। যদিও তারা নামে এখনো মুসলমানই রয়ে গেছে, কিন্তু তারা এমন এক ইসলামের দাবিদার যার অস্তিত্ব বাস্তব জগতে নেই। সাম্রাজ্যবাদ এমন প্রতিটি ইসলামী আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছে, যা প্রাচ্যের দেশসমূহে মুসলামদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য উত্থিত হয়েছিল।

তারপর ... ... ? যে আমেরিকা ইসলামের মোকাবিলা করার জন্য মিশনারী সংস্থাগুলোর পেছনে কোটি কোটি ডলার খরচ করছে সেই আমেরিকাতেই কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হলো। এর অনুসারী ছিলো প্রায় আড়াই লাখ। আমেরিকা এই কৃষ্ণাঙ্গদের জেলে ঢুকিয়ে দিলো এবং জেলখানার মধ্যে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। স্থানীয় পত্রপত্রিকাই তার সাক্ষী। কিন্তু জেলের অভ্যন্তরেও ইসলামের দাওয়াত চলতে থাকে। আমেরিকার পত্রপত্রিকার বর্ণনা অনুযায়ী যেহেতু এসব লোকের ধর্ম ছিলো ইসলাম, তাই তারা নিজেদের উদ্দেশ্যের পথে যে কোন ধরনের যুলুম-নির্যাতন এবং কঠোরতা সহ্য করে। অমানুষিক অত্যাচার তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য থেকে বিন্দুমাত্রও হটাতে পারেনি।

যে আমেরিকা আফ্রিকায় ইসলামের প্লাবনকে প্রতিহত করার জন্য অঢেল সম্পদ খরচ করেছিল, সেই আমেরিকা বাধ্য হলো যে, তার এজেন্টরা ইসলামের পতাকা উন্নত করুক, যাতে আফ্রিকার মুসলিম এলাকাগুলো অন্তত তার এজেন্টদের হাতছাড়া না হতে পারে। কেননা ইসলামী আন্দোলনসমূহ আমেরিকার সমস্ত মিশনারী তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। আল্লাহ্ যদি তাঁর নূরকে জমীনের বুকে নির্বাপিত হতে না দেন, তাহলে মানুষের আর কি সাধ্য আছে তা নির্বাপিত করার ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـؤُا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْـوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُـتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْكَـرِهَ الْكَافِرُوْنَ ٠

"এই লোকেরা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহ তাঁর নূরকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত করবেনই, কাফেরদের জন্য তা যতোই অসহনীয় হোক" (সূরা সফ ঃ ৮)।

ইসলামী বিশ্ব এবং মুসলমানদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আমরা এখন কেবল পাশ্চাত্য জগতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো, যাকে উন্নতির স্রোতধারা ব' দূর পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আজ গোটা পাশ্চাত্য চরম আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্বর শিকার। তার চিরকালের জন্য বেঁচে থাকার একটি মাত্র উপায় আছে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা যদি এই যুগের মানুষদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে ভিন্ন কথা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যদি এই হয়ে থাকে যে, মানুষ আরো কিছুকাল বেঁচে থাকুক, তাহলে মানুষ অবশ্যই নিজেদের অচেতন অবস্থা থেকে জেগে উঠবে এবং তারা জাহান্নামের যে অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে তা থেকে বের হয়ে আসার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবে।

আর বাস্তব সত্য এই যে, মানুষ সজাগ হয়ে গেছে। সে অনুভব করতে শুরু করছে যে, তার জীবনে এমন একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যা কোন কিছুই পূরণ করতে পারবে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সংগঠনসমূহ, যৌনলালসা, ভোগ-বিলাসিতা কোনটাই এই শূন্যতা পূর্ণ করতে সক্ষম হবে না। এই শূন্যতা হচ্ছে মূলত আধ্যাত্মিক শূন্যতা এবং আকীদা-বিশ্বাসগত শূন্যতা।

আজ মানুষের অশান্ত আত্মা এই শূন্যতার দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত করছে। মানসিক ও স্নায়বিক চাঞ্চল্য, খুনখারাবী, আত্মহত্যা ও মাতলামীর আকারে এর প্রতিক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করছে। যান্ত্রিক সভ্যতা বর্তমান পর্যন্ত মানুষকে অবাধ সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার ব্যবস্থা করে দেয়া সত্ত্বেও এই প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটছে। বরং বাস্তব অবস্থা এই যে, যেসব লোক এই নাপাক যৌনাচারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, একদিকে তাদের উম্মাদনা বেড়ে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে বিবেকের গভীরে বিদ্যমান এই শূন্যতার অনুভূতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অতএব অচিরেই মানবতা সজাগ-সচেতন হয়ে যাবে এবং সে অনুভব করবে যে, এই শূন্যতার একমাত্র নিরাময় হচ্ছে "আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান"। কেননা এটা এমন এক উপাদান যার কোন বিকল্প নেই। এই ঈমান ও আকীদার অর্থ রং-বেরং-এর জুব্বা পরিধান অথবা দুই আংগুলের মাঝখানে তসবীহর গোটা ঘুরানো নয় অথবা জীবনের অন্য সমস্ত দিক ও বিভাগকে উপেক্ষা করে কেবল আধ্যাত্মিকতায় মেতে থাকাও এর অর্থ নয়, বরং এই ঈমান ও আকীদা এমন এক

জিনিস, যা মানুষের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পর তার জ্ঞানবুদ্ধি, দেহ-প্রাণ সব কিছুর উপর কর্তৃত্বশালী হয়।

বিশ্বজাহানের বুকে কেবল ইসলামই হচ্ছে পরিপূর্ণ আকীদা, অন্য কোন মতবাদের এই বৈশিষ্ট্য নেই। আপাতত এটাও জরুরী নয় যে, লোকদের নাম হতে হবে মুহাম্মাদ, আহমাদ, আলী ইত্যাদি। কিন্তু মানবতা তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এই সত্য পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, শুধু ইসলামই হলো সেই কাঙ্ক্ষিত ধর্ম ও বিশ্বাস, যা জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এবং জীবনকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

ইসলামের পথে আজ যে বিরাট বিরাট প্রতিবন্ধকতা দাঁড়িয়ে আছে, মানুষ যখন এই দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে থাকবে তখন তা একে একে দূর হয়ে যাবে। মানবেতিহাসে এটাই প্রথম বিপ্লব নয়। সত্য কথা এই যে, মানুষ যখন আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্বের কারণে সৃষ্ট বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যায়, তখন যেসব চিন্তাধারা ও মতবাদের পরিবর্তন অসম্ভব মনে হয় তা অতি সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। মানুষ যখন তার পথভ্রষ্টতার দুর্ভাগ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়, তখন সে স্বেচ্ছায় ধর্মভিত্তিক যে কোন সংগঠনের আশ্রয় নেয়। আর পথভ্রষ্টতাই হচ্ছে আজকের অশান্তির আসল কারণ।

এই অবস্থায় মানুষ সুখভোগের নাপাক উপায় ও পন্থা পরিহার করে যুক্তিসংগত ও স্বভাবসুলভ পন্থাকেই যথেষ্ট মনে করে। তারা এর মধ্যেই প্রকৃত স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব করে। রূপসৌন্দর্য ও দেহ প্রদর্শনীর যেসব পন্থাকে একদিন পাশ্চাত্যের নারীরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে নিয়েছিল এবং যার পরিণতিতে তারা পুরুষদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল আজ তারা এই নোংড়ামী থেকে মুক্তি চায়। অচিরেই নারী সমাজ প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, এই কৃত্রিম জিনিসের তাদের কোন প্রয়াজন নেই। তারা স্বভাববিরুদ্ধ পথ পরিহার করে স্বভাবসম্মত ও পবিত্র পন্থাকে বেছে নিবে। তারা বিপর্যয় ও বিকৃতি সৃষ্টিকারী সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করে পবিত্র জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

এই সময় মানুষ ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং সেই ধর্মটি হবে ইসলাম। মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পের তুলনায় ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি অনেক বড়ো। কেননা তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সেই চিরন্তন নীতি, যা তিনি

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন এবং তা আভ্যন্তরীণভাবেই নিজের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকে।

আর যখন সেই দিন আসবে ... ... তখন কি ঘটবে! আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি বংশধর (Generation) হিসাবে ধরার মতো নয়। এ প্রশ্ন তেমন বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, সেই সময়টি কখন আসবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, এমনটি হবেই এবং ইসলাম বিজয়ীর বেশে আসবেই। কেননা আল্লাহ তাআলা এখনো পর্যন্ত মানবজাতির ধ্বংস চান না। এজন্য ইসলামের বিজয়ী হওয়ার সেই মুহূর্তটি অচিরেই এসে যাবে।

এবং যখন সে দিনটি এসে যাবে। ইনশাআল্লাহ্ আসতে শুরু করেছে। কুফর ও ইসলামের মধ্যখানে যে গভীর খাদ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা ভরাট করতে এবং তার উপর রাস্তা নির্মাণ করার জন্য মুসলিম জনগণ নিজেদের জীবনকে কোরবানী দিচ্ছে। এ কাজ করতে গিয়ে তারা যে দুঃখ-মুসীবত সহ্য করছে, অন্য কোন জিনিস কি তার সমান মূল্যবান হতে পারে? কোন জিনিসই তার সমান হতে পারে না। এটা এমন মহান কোরবানী যার ক্ষতিপূরণ কেবল আল্লাহ তাআলাই দুনিয়া ও আখেরাতে দান করতে পারেন। আর আল্লাহ তাদের এই কোরবানীর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এর প্রতিদান তাঁর কাছেই গচ্ছিত আছে ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ .

"যেসব লোক আল্লাহ্র দীনের সাহায্য করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব শক্তিশালী এবং সব কিছুর উপর বিজয়ী" (সূরা হজ্জ ঃ ৪০)।

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ -

সমাপ্ত

আহসান পাবলিকেশন

ইসলামী বইয়ের প্রকাশক, পরিবেশক ও বিক্রেতা

কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স (নীচতলা), ঢাকা-১০০০

৩৮/৩ বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা - ১২১৭

ডিজাইন : রফিকুল্লাহ গাজালী